IQRA ONLINE ACADEMY

+8801750469027
iqraoa313@gmail.com

উম্মুস সুন্নাহ কোর্স

এই কোর্সটি যাদের জন্যঃ

দ্বীনের ইলম অর্জন যারা শুরু করতে চান।
দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান এক প্যাকেজেই যারা শিখতে চান।
হাদিসের সনদ কিভাবে কাজ করে এর প্রাথমিক জ্ঞান যারা পেতে চান।
শরিয়ত ও আকীদার মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক নিয়ে যারা জানতে চান।
হাদিস থেকে ইলম ও ফায়দা আহরণের পদ্ধতি যারা শিখতে চান।
দ্বীনের প্র্যাকটিকাল জ্ঞান জানতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা।
তাকদীর নিয়ে বিশদভাবে যারা জানতে আগ্রহী।
কেয়ামতের আলামতের অভিজ্ঞান নিয়ে জানতে ইচ্ছুক।
নও মুসলিম ভাই বোন।

খালেস নিয়ত হলো ইলম ও আমলের প্রধান শর্তঃ আমল কবুল হওয়ার ২ শর্ত-
১) ইখলাস
২) রাসূলুল্লাহ'র সুন্নত মোতাবেক হওয়া।

- সাহাবী খাল্লাদ ইবনে রাফি, নামাজ পড়েছিলেন দ্রুত, সেই নামাজকে রাসুল বাতিল ঘোষনা করেছিলেন, কারণ তা রাসূলের দেখানো পদ্ধতিতে হয়নি।
- একইভাবে আবু বুরদা ইবনে নাইয়ার কোরবানী ঈদের নামাযের আগেই পশু জবাই করেছিলেন, তাঁর কোরবানীতে ইখলাস ছিলো, কিন্তু রাসূলের সুন্নত মত হয়নি।

- মুনাফিকরা সাক্ষী দিত আপনি আল্লাহর রাসূল। এরপরেও তাদের সেই সাক্ষী গৃহীত হয়নি, কারণ ইখলাস ছিলো না।

সনদ সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্টঃ

হাদিসটি একাদারে ওমর (রা), তাঁর পুত্র ইবনে ওমর, আবু হুরাইরা, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবু যর গিফারী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর হাদিসের গ্রন্থের মধ্যে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ, আহমদে বর্ণীত হয়েছে।

প্রশ্নকারী হজরত জিবরাইল (আ:) ছিলেন বলে হাদীসটি 'হাদীসে জিবরীল' নামে প্রসিদ্ধ, যেহেতু এতে দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলির বর্ণনা রয়েছে এজন্য একে 'উম্মুস সুন্নাহ'ও বলা হয়ে থাকে। যেভাবে সূরা ফাতেহাকে 'উম্মুল কোরআন' বলা হয়ে থাকে। কারণ হাদিসটি দ্বীনের বিভিন্ন স্তরসমূহ ও স্তম্ভসমূহের আলোচনাকে অন্তর্ভূক্ত করেছে।

শুধুমাত্র হাদিসে জিবরিল নিয়ে গ্রন্থ লিখেছেন এমন অনেক মুহাক্কিকিন আছে। এই হাদিসের শিক্ষা এতই বিপুল যে এ নিয়ে আলাদা গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়েছে। শায়খ আব্দুল মুহসিন আল আব্বাদ, শায়খ উসাইমিন, ইমাম ইবনু জামাআহ সহ অনেক আধুনিক প্রজন্মের আলেমগণও এই হাদীসের উপর আলাদা পুস্তক রচনা করেছেন।

এ কারণে ইমাম মুসলিম তাঁর হাদীসের গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই হাদীসটি এনেছেন। ইমাম নববীও তাঁর চল্লিশ হাদিসের ২য় হাদিস হিসেবে এই হাদিসটিকে গ্রহণ করেছেন। একইভাবে ইমাম বগভী তাঁর মিশকাত গ্রন্থে এই হাদিসটিকে শুরুতেই এনেছেন।

হাদিসে ঘটনায় ভূমিকা রাখা চরিত্রঃ

১) জিবরীল (আ)

২) রাসূলুল্লাহ (সঃ)

৩) সাহাবীগণ (রা)

হাদিসটির মূল পটভূমিঃ

সাহাবীরা সাধারণত রাসূলুল্লাহকে (স) ঘিরে মজলিসে বসতেন আর তিনি কি বলছেন তা মনযোগ দিয়ে শুনতেন। কিন্তু নিজের মনে প্রতিভাত হওয়া প্রশ্নগুলো তাঁরা প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করতেন। খুব বেশি ঘনিষ্ঠ সাহাবীরা মাঝেমধ্যে টুকটাক প্রশ্ন করলেও সিংহভাগ সাহাবিদের মনের প্রশ্ন মনেই রয়ে যেত। এছাড়া সেই সময় দ্বীনের সব বিধান সম্পর্কে অহী নাযিলের কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিলো। ফলে আল্লাহ চাইলেন এমনভাবে একটি ঘটনা ঘটাবেন যার মাধ্যমে সাহাবীরা একদিকে দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ শিখতে পারবেন, অপরদিকে রাসূলুল্লাহকে (স) আদবের সাথে কিভাবে প্রশ্ন করা যায় সে পদ্ধতিও জানতে পারবেন। সুতরাং তিনি জিবরীলকে (আ) একজন মুসাফিরের বেশে পাঠিয়ে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করলেন। সেই ঘটনাটিকে হাদিসের ভাষায় হাদিসে জিবরীল বলে অভিহিত করা হয়।

ইবনে হাজর বলেন, নিঃসন্দেহে ঘটনা একটিই ছিলো। কিন্তু বর্ণনাকারীদের বর্ণনাভঙ্গি একেক রকম ছিলো। ব্যাপারটা বুঝা যায় মাতর ওয়াররাকের বর্ণনা থেকে, তিনি ইসলামের প্রশ্নটিকে প্রথমে এনে এরপর ইহসানের প্রশ্নটি দ্বিতীয়তে আনেন, এবং সবশেষে ঈমানের প্রশ্নটির আনেন। এ ধরণের আগপিছ বর্ণনাকারীদের পক্ষ থেকে ছিলো, আর প্রকৃত ঘটনা একটাই ছিলো।

হাদিসটির দ্বিতীয় প্রেক্ষাপটঃ

বসরায় মা'বাদ আল-জুহানী নামের এক ভ্রান্ত ব্যক্তি দাবি করে বসলোঃ তাকদীর বলতে কিছু নেই, প্রতিটি বিষয় তাৎক্ষণিক ঘটে। আগে থেকে কিছুই নির্ধারিত নেই। এই মতবাদটি সে জোরেশোরে প্রচার করতে শুরু করে। **ইয়াহয়া ইবনে ইয়ামার ও হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান** নামের দুইজন তাবেয়ী একবার উমরা করতে গিয়ে কোন সাহাবীর খোঁজ পান কিনা তার অনেষণ করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. কে পেলেন। উভয়ে উনার একেবারে গা ঘেঁষে দুইজন দুইপাশ দিয়ে বেষ্টন করে চলতে লাগলেন। তাঁরা উনাকে বললেন, আমাদের দেশে নতুন মতবাদের একদল লোক আবির্ভূত হয়েছে। তারা একদিকে বেশ কুরআন শরীফ পাঠ করে থাকে এবং জ্ঞান-চর্চা তথা ধর্মীয় গবেষণাদিও করে থাকে, কিন্তু অন্যদিকে তারা তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসী নয়; বরং তারা তাকদীরকে অস্বীকার করে থাকে। এতদশ্রবণে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বললেন, তাদেরকে বলে দিও যে, আমাদের তথা খাঁটি মুসলিমগণের সঙ্গে তাদের কোনো সংশ্রব নেই; তারা মুসলিম জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি, তারা যতো প্রকার ও যতো বড় নেক আমলই করুক না কেন, এমনকি উহুদ পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণও যদি তারা আল্লাহর রাস্তায় দান-খয়রাত করে, তথাপি তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না; তারা তার কোনো সওয়াবও পাবে না। যতোক্ষণ না তারা উক্ত ইসলামবিরোধী ধারণা ও মতবাদ পরিত্যাগ করে **তাকদীরের** ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান স্থাপন না করে।

প্রেক্ষাপট থেকে শিক্ষাঃ

এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয়, তাবেয়ীনদের যুগেও হক ও সত্যকে খুঁজে নেয়ার পদ্ধতি কেমন ছিলো। তাবেয়ীনকে যেকোন বাতিল বা ফিতনাপূর্ণ ঘটনার সম্মুখীন হলেই এর সমাধানের জন্য সাহাবিদের শরণাপন্ন হতেন। হোক তা দ্বীনের যে পর্যায়ের ছোট্ট বিষয়ই হোক। যেমন আক্বীদা, মাসায়েল ইত্যাদি।

এই ঘটনা থেকে আরো শিক্ষণীয় বিষয় হলো, মক্কায় হজ বা উমরা করতে যাওয়া ব্যক্তিরা কেবল হজ উমরার নিয়তেই যেতেন না, তাঁরা আলেমদের সান্নিধ্য ও ইলম অন্বেষণের নিয়তও অন্তরে লালন করতেন।

এই ঘটনায় আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো কিছু শিখতে হলে শিক্ষকের সাথে ইলমী ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করা জরুরী। যেমনটা আমরা দেখলাম দুই তাবেয়ী ইবনে উমরকে কিভাবে আলিঙ্গন করে নিলেন। একইভাবে আমরা হাদীসে জিবরীলেও দেখবো কিভাবে জিবরিল (আ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকটে ঘেঁষে বসেছিলেন।

আরো একটি বিষয় হলো, আলেমের কাছ থেকে যেকোনো অবস্থাতেই ইলম অর্জন করা সম্ভব। বদা অবস্থায় হোক বা হাঁটার অবস্থায় কিংবা দাঁড়ানো অবস্থায়, প্রশ্ন করে জেনে নেয়াটা আদবের খেলাফ নয়।

সুন্নাহ'র জগতে হাদিসটির অবস্থান ও মূল্যায়নঃ

ইমাম কুরতুবী বলেন, হাদিসটির 'উম্মুস সুন্নাহ' নামকরণ সার্থক হয়েছে। কারণ হাদিসটি সুন্নতের সমস্ত জ্ঞানকে আয়ত্ত করে নিয়েছে।

কাজী ইয়াদ্ব বলেছেন, এই হাদিসটি সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ইবাদতকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, দ্বীনের ভূমিকা ঈমান থেকে শুরু করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব শারীরিক ইবাদতের জ্ঞানকে বহন করছে। অন্তরের ইখলাস থেকে নিয়ে আমলের যত্নআত্তি, এমনকি শরিয়তের সমস্ত জ্ঞান এই হাদিসটির দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, এবং এই হাদিস থেকেই উৎসারিত হয়।

ইবনে হাজর আসকলানী তাঁর লিখিত বিখ্যাত ফতহুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এই কারণে আমি হাদিসটিকে ঘিরে পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা আলোচনা করেছি, কিন্তু আমার এত সুদীর্ঘ ব্যাখ্যাও এই হাদিসের প্রকৃত মর্ম তুলে ধরতে নিছক অল্পই মনে হবে। তাই আসলে বলতে গেলে আমার সংক্ষিপ্ত ব্যখ্যার শর্ত এই হাদিসের ক্ষেত্রেও বিঘ্নিত হয়নি।

হাদীসটির আরবী টেক্সটঃ

حديث عمر فلفظه :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدرى أيهم هو حتى يسأل, فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه, فبنينا له دكانا من طين, كان يجلس عليه, وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، **بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب, شديد سواد الشعر, لا يرى عليه أثر السفر, ولا يعرفه منا أحد** أحسن الناس وجها, وأطيب الناس ريحا, كأن ثيابه لم يمسها دنس, حتى سلم في طرف البساط, فقال: السلام عليك يا محمد, فرد عليه السلام, قال: أأدنو يا محمد؟ قال: ادنه, فما زال يقول: أأدنو مرارا, ويقول له: ادن, **حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم**,كما يجلس أحدنا في الصلاة, **فأسند ركبتيه إلى ركبتيه, ووضع كفيه على فخذيه, وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله, وأن محمدا رسول الله, وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا** وتعتمر, وتغتسل من الجنابة, وتتم الوضوء, **قال: صدقت, قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه, قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر , وتؤمن بالقدر خيره وشره, قال: صدقت, قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك, قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل, قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها, وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان, قال: ثم انطلق ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: «رُدُّوا عَلَيَّ»، فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوا فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا، فلبث مليا, ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم, قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم** وفي رواية :هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا فخذوا عنه, فوالذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه, وما عرفته حتى ولى. **فمكث يومين أو ثلاثة.**

সরল অনুবাদঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিয়মিত সাহাবিদের মাঝে বসতেন, কোনো মেহমান তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে রাসূলকে আলাদা করে চিনতে পারতেন না। ফলে আমরা আবেদন করলাম একটি আসন তৈরি করতে যেন কোন আগন্তুক এসে তাঁকে সহজেই চিনতে পারে। অতঃপর আমরা তাঁর জন্যে একটি মাটির ঢিবির আসন তৈরি করে দিলাম। এরপর থেকে তিনি সেই আসনেই বসতেন। একদিন আমরা তাঁর (সা:) নিকট বসে ছিলাম, এমন সময় সাদা ধবধবে জামা পরিহিত মিশমিশে কালো চুলের একজন লোক আমাদের নিকট উদয় হলেন। তাঁর মধ্যে ভ্রমণের

কোন চিহ্ন ছিল না। আবার আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতেও পারলো না। দেখতে খুবই সুদর্শন এবং মিষ্টি সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ছিলো। মাদুরের প্রান্তে এসে তিনি সালাম দিয়ে বললেন- আসসালামু আলাইকা ইয়া মুহাম্মদ! রাসূলুল্লাহ তাঁর সালামের জবাব দিলে তিনি বললেন- আমি কি আরেকটু কাছে আসতে পারি? রাসূল উত্তর দিলেন- কাছে আসো। এভাবে বেশ কয়েকবার তিনি আরো নিকটে আসার অনুমতি চাইলেন, রাসূলুল্লাহও কাছে আসার জন্য বললেন। তিনি নবী করীম (সা:) -এর নিকটে এসে বসলেন, যেভাবে আমরা নামাজে বসি। অত:পর রাসূলের দু'জানুর সাথে নিজের দু'জানু মিলিয়ে এবং নিজের দু'হাত তাঁর দুই উরূর উপর রেখে বললেন;'হে মোহাম্মদ! আমাকে বলুন, (ইসলাম কি?) হুজুর উত্তরে বললেন; 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ (সা:) তাঁর রসূল-এ ঘোষণা করা, নামাজ কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রমজানের রোজা রাখা এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ্ব করা- যদি সেখানে পৌঁছানোর সামর্থ্য থাকে, উমরাহ করা, জানাবাতের গোসল করা, পরিপূর্ণভাবে অজু করা...'। তিনি বললেন; 'ঠিক বলেছেন'।তাঁর প্রশ্নোত্তরে আমরা আশ্চর্য বোধ করলাম। প্রশ্নও করেছেন আবার তার সত্যায়নও করছেনঅত:পর জিজ্ঞাসা করলেন; 'আমাকে বলুন, ঈমান কাকে বলে?' রাসূলুল্লাহ উত্তর করলেন, 'আল্লাহতে বিশ্বাস করা এবং তার ফেরেশতাগণে, তার কিতাব সমূহে, তার নবী-রসূলগণে ও পরকালে বিশ্বাস করা এবং তকদীরে, তার ভালোতে ও মন্দতে বিশ্বাস করা'। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। এবার আমাকে বলুন- ইহসান কি? রাসুলুল্লাহ বললেন- এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদিও তুমি তাঁকে দেখতে পাওনা, কিন্তু এটা জেনে রাখা যে তিনি ঠিকই তোমাকে দেখছেন। এখন আমাকে বলুন, কেয়ামত সম্বন্ধে। রাসূলুল্লাহ উত্তর বললেন, 'এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশি জানেনা'। (আমি আপনি অপেক্ষা অধিক কিছু জানি না।তিনি বললেন, কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে বলুন, রাসূলুল্লাহ বললেন- 'দাসী তার মালিককে জন্ম দিবে এবং জুতাবিহীন, বস্ত্রহীন দরিদ্র মেষ পালকদেরকে দালানকোঠা নির্মাণ নিয়ে পরস্পর গর্ব করতে দেখবে' নাঙ্গাপা, বস্ত্রহীন মূক-বধিরকে দেশের রাজা বা শাসক হতে দেখবে। হজরত উমর (রা:) বলেন, "অতপর লোকটি চলে গেলেন এবং আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। এক সময় রাসূলুল্লাহ আমাকে বললেন; 'উমর! প্রশ্নকারী লোকটিকে চিনলে?' আমি বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই তা জানেন'। রাসূল বললেন; 'তিনি হচ্ছেন হজরত জিবরাইল। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তোমাদের নিকট এসেছিলেন'।"

ইবনে হাজর বলেন, ইবনে মুনদাহ তাঁর কিতাবুল ঈমানে ইমাম মুসলিমের শর্তে উল্লেখ করেছেন- এক ব্যক্তি নবী (সঃ) এর শেষ বয়সে আসলেন... এরপর এই হাদিসটির উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে হাদিসটি ঘটেছে বিদায় হজের পর। প্রায় তাঁর একেবারে শেষ কিছু মজলিসে ঘটে থাকবে। এই ঘটনার মাস তিনেকের মধ্যেই রাসুলুল্লাহ'র (সঃ) ইন্তিকাল হয়। এছাড়া হাদিসে ইসলামের রুকুন হজের উল্লেখ আছে। আর হজ ফরজ হয় হিজরী দশম বছরে। অর্থাৎ, শরিয়তের সব বিধান পরিপূর্ণভাবে নাযিল হওয়ার পরেই এই ঘটনাটি ঘটে যেন এক বৈঠকেই সম্পূর্ণ দ্বীনের বিবরণ উঠে আসে। দ্বীনের যে বিষয়গুলো বিচ্ছিন্নভাবে আলোচিত হতো তা যেন এক আলোচনাতে সবার জানা হয়ে যায়।

বিঃদ্রঃ সবুজ অংশ হাদীসের মূল টেক্সটঃ

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা:) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিয়মিত সাহাবিদের মাঝে বসতেন,

ইবনে হাজর (রহ) বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাম) আড়াল থেকে মজলিস পরিচালনা করতেন না, আবার কারো থেকে আলাদা হয়েও বসতেন না।

এটি রাসূলুল্লাহ’র (সঃ) নম্রতা ও সরলতার বহিপ্রকাশ ছিলো। কখনও আরব বেদুইন মুর্খ ব্যক্তিরা এসে সরাসরি প্রশ্ন করতেন- তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ কে? (সঃ)। তিনি এমনই সাদামাটাভাবে সবার সাথে মিশে বসতেন যে কেউ এলে চট করে তাঁকে আলাদাভাবে চিনে নিতে পারতেন না।

কখনও কোনো মেহমানকে তাঁর দরবারে উপস্থিত করা হলে মেহমান বিভিন্ন প্রশ্ন করার জন্য রাসূলকে আলাদা করে চিনতে পারতেন না। ফলে আমরা রাসূলুল্লাহর কাছে আবেদন করলাম তাঁর জন্যে একটি আসন তৈরি করতে যেন কোন আগন্তুক আসলে তাঁকে সহজেই চিনতে পারে। অতঃপর আমরা তাঁর জন্যে একটি মাটির ঢিবির আসন তৈরি করে দিলাম। এরপর থেকে তিনি সেই আসনেই বসতেন। আমরাও তাঁকে ঘিরে বসতাম।

ইমাম কুরতুবী এই অংশ থেকে প্রতিবিধান বের করেছেন যে, আলেম শিক্ষকদের জন্য বিশেষ উচু স্থানে বসে পাঠদান করা মুস্তাহাব যদি তেমন প্রয়োজন দেখা দেয়।

আধুনিক স্কলারগণ হাদিসটির এই অংশ থেকে চেয়ার-সোফা ইত্যাদিতে বসাকে সুন্নাত বিরোধী হবেনা বলে মন্তব্য করে থাকেন।

- এ অংশ থেকে আরো বুঝতে পারি যে সাহাবীরা কতটা উদ্‌গ্রীব থাকতেন রাসূলুল্লাহ’র (সঃ) ইলমী মজলিসে বসার জন্য। হযরত উমর (রা) বলেনঃ আমার বাসা ছিলো একটু উচু টিলায়, আমি আর আমার এক প্রতিবেশী ভাই পালা করে রাসূলুল্লাহ’র মজলিসে বসতাম। একদিন সে যেতো আর আমি কাজে যেতাম, অন্যদিন আমি রাসূলুল্লাহ’র কাছে গেলে সে কাজে যেত।
- রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ আমার বাড়ি থেকে মসজিদের মিম্বর পর্যন্ত হলো রিয়াদুল জান্নাহ। অর্থাৎ জান্নাতের বাগান। কেন তিনি এই অংশকে জান্নাত বললেন? কারণ এই অংশটিতেই তাঁর সকল ইলমী ও নসিহতের মজলিস বসতো। সেখানে সর্বদা দ্বীনী আমেজ শোভা পেত।
- রাসুলূল্লাহ (সঃ) একবার বললেনঃ আমি কি তিনজনের গল্প বলবো তোমাদেরকে? তাদের একজন দ্বীনের মজলিসে আসলো, এসে একেবারে ভিতরে জায়গা করে নিলো, আল্লাহও তাঁকে নিজের আশ্রয়ে জায়গা দিলেন। আরেকজন লজ্জায় একদম পিছনে বসলো, আল্লাহও তাঁকে আশ্রয়ে জায়গা দিতে লজ্জা করলেন। আরেকজন না বসেই মুখ ফিরিয়ে চলে গেলো। আল্লাহও তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে

নিলেন। তাই উলামারা বলেন, ইলমের মজলিস দেখলে যেন কিছুক্ষণ বসি আমরা। কারণ দ্বীনের মজলিসগুলোতে আল্লাহর রহমত বর্ষণ হতে থাকে।

একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (সা:) -এর নিকট বসে ছিলাম, এমন সময় সাদা ধবধবে জামা পরিহিত ও মিশমিশে কালো চুলের একজন লোক আমাদের নিকট হাজির হলেন। তাঁর মধ্যে (আগন্তুকের ন্যায়) ভ্রমণের কোন চিহ্নও দেখা যাচ্ছিল না। আবার আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতেও পারলো না। দেখতে খুবই সুদর্শন এবং মিষ্টি সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ছিলো। তাঁর নির্দাগ পোশাকে ময়লার ছিটেফোঁটা ছিলোনা।

এই অংশ থেকে মুহাদ্দিসিনরা বের হরেছেন যে, ইলমের মজলিসে সুন্দর পোশাক ও পরিপাটি হয়ে উপস্থিত হওয়া মুস্তাহাব। হাদিসটিতে প্রশ্নকারীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে এসেছে- চকচকে সাদা পোশাক, কুচকুচে কালো চুল, পোশাকে ভ্রমণ-ক্লেশের চিহ্ন ছিলোনা। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে- সুন্দর চেহারা ও সুমিষ্ট গন্ধ, পোশাকে পরিচ্ছন্নতার ছোঁয়া ছিলো। এটি ছাত্রের পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটি চালচলনের দলিল হিসেবে কাজ করে।

- লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, আগন্তুকের যে দুইটি বৈশিষ্টের কথা এখানে এসে তার একটি সহজাত বা প্রকৃতিগত, আরেকটি সাজসজ্জা বা উপার্জিত। কালো চুলের বৈশিষ্ট সহজাত। আর সফেদ জামার বৈশিষ্ট অর্জিত।
- জিবরিল (আ) ইতোপূর্বে মরিয়াম (আ) এর কাছেও মানুষের আকৃতি নিয়ে এসেছিলেন। যেমনটা আমরা সূরা মরিয়ম থেকে জানতে পারি। তিনি মানব আকৃতিতে ইবরাহীম (আ) এর কাছেও এসেছিলেন মেহমানের বেশ ধরে। একইভাবে লূত (আ) এর কাছেও এসেছিলেন। জনপদ ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ নিয়ে।
- উমর (রা) এর বর্ণনা থেকে বুঝা যাচ্ছে তিনি এই আগন্তুকের বিষয়ে শুরু থেকেই অবাক হচ্ছিলেন। কারণ একে তো পরিচিত কেউ নয়, পরিচিত না হলে দূরের এলাকা থেকে আসা কেউ হবে। কিন্তু দূর থেকে আসলে তো গায়ে ধূলো থাকার কথা, তাও নেই।
- সাধারণত জিবরিল (আ) মানব আকৃতি নিয়ে আসতে হলে রাসূলুল্লাহ'র (সঃ) কাছে সাহাবী দিহয়াতুল কলবীর রূপ ধরে আসতেন। কিন্তু এই ঘটনায় তিনি সেদিন সম্পূর্ণ নতুন ও ভিন্ন একটি রূপ ধারণ করেছেন। উদ্দেশ্য ছিলো একটি অপরিচিতের আবহ তৈরি করা।

হাদিসটিতে এই শিক্ষা রয়েছে যে, প্রতিটি মুসলিমের উচিত ইলমের মজলিসে নিয়মিত উপস্থিত হওয়া। এবং উপস্থিত হওয়ার সময় সুন্দর পোশাকে ও পরিপাটি হয়ে আসা। একইভাবে দ্বীনদার আলেমের নিকট গমন করতেও এমন বেশভূষা গ্রহণ করা। এবং ভদ্রতা ও সমীহের সাথে আলেমের কাছে দ্বীনের বিষয়ে প্রশ্ন করা।

- আগন্তুকের এমন চুলচেরা বিশ্লেষন আমাদের কাছে এসেছে একমাত্র এই কারণে যে তাঁর পোশাক আশাক, চালচলন দৃষ্টি আকর্ষণকারী ছিলো। ফলে আমরা দেখি যে তিনি কিভাবে এলেন, কিভাবে

কথা বললেন, কেমন দেখতে ছিলেন সবকিছুই সাহাবিদের মনযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো, কারণ আল্লাহ তাঁকে এমন এক ভূমিকা নিয়ে পাঠিয়েছেন যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে গোটা মজলিস তাঁর কথা ও কাজের দিকে পূর্ণ মনযোগ দেয়। আর যেকোনো ইলমী ব্যক্তিত্বের চালচলন এমনই চমকপ্রদ হওয়া উচিত।

মাদুরের প্রান্তে এসে তিনি সালাম দিয়ে বললেন- আসসালামু আলাইকা ইয়া মুহাম্মদ!

- **এই অংশ থেকে বুঝা যায়, প্রশ্নকৃত ব্যক্তির উচিত নম্রতা অবলম্বন করা। এবং প্রশ্নকারীর থেকে কিছু ভুলভ্রান্তি ও শিষ্টাচার বহির্ভুত কিছু ঘতে থাকলে তা মার্জনার দৃষ্টিতে দেখা। কারণ রাসূলের মজলিসে আগত ব্যক্তিটিও এমন আচরণ দেখাচ্ছিলো। এবং শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ'র নাম ধরে ডাকছিলো। যে বিষয়ে কোরআনে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তবে জীবরাঈল এমন গ্রাম্য বেদুইনদের মত আচরণ করেছিলেন যেন সাহাবীরা তাঁর আসল পরিচয় জেনে না ফেলে।**
- **জিবরিল (আ) এসে দৃশ্যায়ন করে দেখিয়েছেন সাহাবীদেরকে কিভাবে ইলম অর্জন করতে হয়, ইলম অর্জন করতে প্রয়োজনে দূর দূরান্তে যেতে হয়। সাধারণ কোন ব্যক্তি বা জাহেল কিংবা শুধুমাত্র ইলম হাসিল হয়না। ইলম অর্জনের স্বার্থে প্রশ্ন করতে হয়, আলোচনা করতে হয়, সংশয়ের অপনোদন করতে আলেমের শরণাপন্ন হতে হয়।**

রাসূলুল্লাহ তাঁর সালামের জবাব দিলে তিনি বললেন- মুহাম্মদ, আমি কি আরেকটু কাছে আসতে পারি? রাসূল উত্তর দিলেন- কাছে আসো। এভাবে বেশ কয়েকবার তিনি আরো নিকটে আসার অনুমতি চাইলেন, রাসূলুল্লাহও কাছে আসার জন্য বললেন। তিনি নবী করীম (সা:) -এর নিকটে এসে বসলেন, যেভাবে আমরা নামাজে বসি।

- সেই সময় ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যম ছিলো আপনজনকে নাম ধরে ডাকা। হতে পারে এই নাম ধরাটা সেই ধরণেরই অংশ ছিলো।
- ছাত্রের আদব ও আগ্রহ শিক্ষকের মনে প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে দেয়ার মনোভাব তৈরি করে। অনেক সময় দেখা যায় উস্তাদের উত্তর একেক ছাত্রের জন্য একেক রকম হয়ে থাকে। ছাত্রের মনোযোগ ও আদবের ভিত্তিতে আসলে শিক্ষকের ইলমের বক্ষ উন্মোচন হয়। এটাই নিয়ম যে, যে এগিয়ে আসে তাঁর দিকেও এগিয়ে আসা হয়।
- অনেক আলেমের মতে, জিবরিল এখানে রাসূলুল্লাহকে নাম ধরে ডেকেছেন এটি নিষেধাজ্ঞার আগের ঘটনা। পরবর্তীতে আল্লাহ রাসূলুল্লাহকে নাম ধরে ডাকার নিষেধ সূচক আয়াত নাযিল করেছেন।
- উলামাগণ বলেনঃ জিবরিল (আ) নিজের উরুর উপরেই নিজের হাতের তালু রেখেছিলেন, এই মতটি অধিকতর সামঞ্জস্য রাখে। শিক্ষকের সামনে ছাত্রের উপবেশন আদবের সর্বোচ্চ চিত্র এটি। যা আদব ও মনযোগের উপবেশন। ইলম অর্জন করার পূর্ণ প্রস্তুতি বুঝায়।

হাদিসে পরিশ্রমী নিষ্ঠাবান তালেবে ইলমের দারসে বসার পদ্ধতি নিয়ে শিক্ষা রয়েছে। ফেরেশতাদের সর্দার জিবরিল, শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা এসে শিক্ষক মুহাম্মদের নিকট নিজেকে বিনয়ীভাবে সঁপে দিয়েছেন। নৈকট্য গ্রহণ করেছেন।

- আরেকটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করি যে, জিবরিল (আ) মজলিস ভেদ করে এমন ভঙ্গি নিয়ে নবীজির কাছে আসলেন যেন তাঁর তীব্র প্রয়োজনীয় জরুরী কথা আছে। তিনি পরিবেশটাতে এমন এক মাত্রা যোগ করলেন যাতে সবাই চোখ-কান খাঁড়া করে তাদের কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়।
- জিবরিল (আ) দেখা যাচ্ছে অন্যান্য সাহাবিদের তুলনায় নবীজির কাছে বেশি করে ঘেঁষে বসছিলেন ব্যাপারতা যাতে এমন দাঁড়ায় যে তিনি জা জানতে এসেছেন তা খুবই জরুরী এবং রাসূলুল্লাহ'র (সঃ) কোনো কথায় যেন মিস হয়ে না যায়।
- এ অংশে আমরা বুঝতে পারি যে, অন্যকে শিখানোর উদ্দেশ্যেও যদি কোনো আলেম অন্য আলেমের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে আসেন তিনিও যেন নম্রতার সাথে বসেন। তিনি বললেন না যে আমি এটার উত্তর জানি। বরং তিনি না জানার মত করেই প্রশ্ন করবেন, যাতে করে যাকে পেওশ্ন করা হচ্ছে উনার মধ্যে থাকা নতুন কোনো ইলম বের হয়ে আসে। এবং আমরা সাধারণত কেউ অজানা বিষয়ে জানতে আসলে তাঁকে বেশি গুরুত্ব দিই। তাঁকে নিজের ইলম থেকে উজাড় করে দিই। যদি আমরা জানি যে, বিষয়টা তাঁর জানাই আছে তখন তেমন আগ্রহ দেখাই না। এছাড়া কেউ জেনে এসে তর্ক করতে আসলে প্রকৃতপক্ষে সে আরো অনেক অজানা বিষয় থেকে মাহরুম হয়ে যায়। তাই কারো কাছে কিছু জানতে গেলে আমাদের উচিত এমন নিয়ত রাখা যে যদি এর উত্তর আমি জেনেও থাকি তথাপি উনার কাছে হয়তো আরো বিস্তারিত পরিসরে কিছু জানার সুযোগ হবে।

ইলম ও তালিবে ইলমের আদবঃ

ধৈর্য: জিবরীলের মুসাফির বেশ এই দিকটি ইঙ্গিত করে যে ইলমের জন্য দীর্ঘ সফর ও সময়ের ধৈর্য্য ধারণ করা।

ইলমের লোভঃ আমরা জিবরিল (আ) এর মধ্যে প্রশ্ন করে জেনে নেয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করি।

কর্মনিষ্ঠা: পরিপাটি বেশভূষা মানুষের অধ্যাবসায়ের দিকটি প্রমাণ করে।

ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করা: ইসলামের পরিচয়ের মধ্যে ঈমানের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করার বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

আল্লাহ্ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এ অনুভুতি লালন করা: ইহসানের পরিচয়ে বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

সময়ের সদ্ব্যবহার করা: জিবরিল যুবকের আকৃতি নিয়ে এসেছেন একথা বুঝাতে যে যৌবন হলো জ্ঞান অর্জনের জন্য সঠিক সময়।

মেধা ও সতর্কতা: প্রতিটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে জিবরিল সতর্কতার সাথে মেপে মেপে শব্দ চয়ন করছিলেন।

পাকাপোক্তভাবে মুখস্ত করা: পুরো হাদিসটি দ্বীনের বিস্তারিত বয়ান যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও জিবরিলের মুখস্থ ছিলো।

কিতাব অধ্যয়ন: প্রতি বছর জিবরিল ও রাসূলুল্লাহ (সঃ) একে অপরের সাথে কোরআন অধ্যয়ন করতেন।

সঠিক সঙ্গি নির্বাচন করা: রাসূলুল্লাহ'র ছাত্র ও সাহাবীদের শিক্ষক হিসেবে আল্লাহ জিবরিলকে বেঁছে নিলেন।

উস্তাদের সাথে আদব রক্ষা করা: জিবরিলের আচরণে বেদুইন প্রভাব থাকলেও ইলমের আদব অটুট ছিলো।

উস্তাদের সাথে আদব রক্ষা করা: উস্তাদের নৈকট্য অর্জন ও আদব রক্ষায় জিবরিল চমৎকার ভূমিকা রেখেছেন।

- দ্বীনের ইলম না থাকলে যেকোনো সময় পদস্খলন হতে পারে। যেমন মা'বাদ আল জুহানীর হয়েছিলো। সে আল্লাহকে পুতপবিত্র প্রমাণ করতে গিয়েই তাকদীরকে অস্বীকার করেছিলো।

মজলিসের আদবঃ

কাউকে উঠিয়ে দিয়ে তার স্থানে না বসা: মজলিস বা বৈঠকে উপবিষ্ট কাউকে তার আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসা যাবে না। নবী করিম (সা.) বলেন, 'কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে তার বসার জায়গা থেকে তুলে দিয়ে সেখানে বসবে না।' (বুখারি, হাদিস : ৬২৬৯)

যেমনটা আমরা হাদিসে জিবরিলেও বিষয়টি দেখলাম যে জিবরিল (আ) কাউকে সরিয়ে জায়গা করে নেননি।

দুজনের মধ্যখানে না বসা : কোনো বৈঠকে দুই ব্যক্তি পাশাপাশি বসলে তাদের মধ্যে গিয়ে বসা সমীচীন নয়, বরং তাদের পাশে বসবে। রাসুল (সা.) বলেন, 'কারো জন্য এটা বৈধ নয় যে সে দুই ব্যক্তিকে পৃথক করে দেবে (তাদের মধ্যখানে বসবে) তাদের অনুমতি ছাড়াই।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৭৫২)

হাদিসে জিবরিলেও তিনি সরাসরি খালি জায়গায় নবীজির সামনে এসে বসেছেন। দুইজনের মধ্যে এসে বসেন নি।

কেউ কোনো প্রয়োজনে উঠে গেলে তার স্থানে না বসা : মজলিসে বা সভায় বসার পরে কেউ কোনো প্রয়োজনে উঠে গেলে তার জায়গায় বসা উচিত নয়। আর যদি কেউ কারো আসনে বসে পড়ে, তাহলে ওই ব্যক্তি ফিরে এলে তার জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। রাসুল (সা.) বলেন, 'কেউ তার আসন থেকে উঠে গিয়ে পুনরায় ফিরে এলে সে-ই হবে তার বেশি হকদার।' (মুসলিম, হাদিস : ২১৭৯)

তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দুজনে কানে কানে কথা না বলা : বৈঠকে বসে দুজনে কানে কানে কথা বলা বা গোপনে পরামর্শ করা শিষ্টাচারবহির্ভূত। মহান আল্লাহ বলেন, 'ওই কানাঘুষা শয়তানের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়, যা মুমিনদের দুঃখ দেওয়ার জন্য করা হয়। অথচ তা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া। অতএব, মুমিনদের উচিত আল্লাহর ওপর ভরসা করা।' (সুরা মুজাদালাহ, আয়াত : ১০)

হাদিসে জিবরিলে, আমরা দেখি জিবরিলের বেশভূষা ও কথাবার্তায় সাহাবীরা প্রচন্ড অবাক হচ্ছিলেন। এরপরেও কেউ কারো সাথে এই বিষয়ে কানাঘুষা করেননি।

হাতে বা দেয়ালে ঠেস দিয়ে না বসা : পেছনে হাত রেখে ঠেস দিয়ে বসা বা দেয়ালে ঠেস লাগিয়ে বসা মজলিসের আদব পরিপন্থী। তাই এভাবে না বসে সোজা হয়ে বসা উচিত। শারিদ ইবনে সুওয়াইদ (রা.) বলেন, একবার রাসুল (সা.) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমি আমার বাঁ হাত পিঠে নিয়ে তার পাতার ওপর বসেছিলাম। তিনি বলেন, 'তুমি কি তাদের মতো বসছ, যারা অভিশপ্ত?' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৮৪৮)

জিবরিল (আ) হাদিসে জিবরিলের ঘটনায় নিজের হাত হাটুতে রেখে নম্রতার সাথে বসেছেন। দেয়ালে বা কেবল হাতের উপর ঠেস দিয়ে বসেননি।

মজলিসে হাসাহাসি না করা : মজলিসে বা সভায় বসে হাসাহাসি ও খেল-তামাশা করা যাবে না। এতে একদিকে বৈঠকের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, অন্যদিকে আলোচকের কথা শুনতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমরা বেশি হাসবে না। কারণ বেশি হাসি অন্তরের মৃত্যু ঘটায়।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪১৯৩)

এমনটা আমরা হাদিসে জিবরিলেও দেখি যে সেখানে আগন্তুকের অদ্ভুত আচরণে কেউ হাসাহাসি করেনি।

গুপ্তচরবৃত্তি ও দোষত্রুটি তালাশ না করা : মজলিসে বা সভায় কারো দোষত্রুটি অনুসন্ধান করার জন্য বা গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য গমন করা যাবে না। নবী করিম (সা.) বলেন, 'তোমরা কারো প্রতি কুধারণা পোষণ কোরো না। কেননা কুধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। একে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ কোরো না, একে অন্যের ব্যাপারে মন্দ কথায় কান দিয়ো না এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ কোরো না, বরং আল্লাহর বান্দারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।' (বুখারি, হাদিস : ৬০৬৪)

হাদিসে জিবরিলের বর্ণনাকারী হযরত উমরের বাচনভঙ্গি লক্ষ্য করলে আমরা দেখি সেখানে আগন্তুক নিয়ে বিন্দুমাত্র দোষত্রুটির কথা নেই। বরং জিবরিলের এত অদ্ভুত কান্ডের পরেও তাঁর প্রশংসাসূচক বর্ণনা ছিলো।

ইসলামবিরোধী বৈঠকে যোগদান না করা : ইসলামবিরোধী বৈঠক পরিত্যাগ করতে হবে। যে বৈঠকে কোরআন-হাদিসের বিরুদ্ধে কথা হয়, যেখানে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলকে নিয়ে উপহাস করা হয়, এমন বৈঠক বর্জন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তিনি কোরআনে তোমাদের প্রতি এই আদেশ দিয়েছেন যে যখন তোমরা মানুষের কাছ থেকে কোরআনের আয়াত নিয়ে অবিশ্বাস ও বিদ্রুপ শুনবে, তখন তাদের সঙ্গে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। অন্যথায় তোমরাও তাদের সদৃশ গণ্য হবে। আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের জাহান্নামে একত্র করবেন।' (সুরা নিসা, আয়াত : ১৪০)

হাদিসে জিবরিল পরিপূর্ণ একটি দ্বীনী মজলিসের বিবরণ।

- **ইমাম নববী বলেন, উস্তাদের সামনে প্রশ্নকারীর উচিত আদব রক্ষা করা। এবং প্রশ্নের ক্ষেত্রে সচেতন থাকা।**

অত:পর রাসূলের দু'জানুর সাথে নিজের দু'জানু মিশিয়ে এবং নিজের দু'হাত তাঁর দুই উরূর উপর রেখে বললেন; 'হে মোহাম্মদ! ইসলাম সম্বন্ধে আমাকে সংবাদ দিন, (ইসলাম কি?)

- জিবরিল (আ) রাসূলুল্লাহর (সঃ) হাটুতে হাত রেখেছিলেন, প্রশ্নের উত্তর জানার তীব্র চাহিদার বশীভূত হয়ে। যেমনটা আমরাও উদ্‌গ্রীব হলে এমনটা করি। এটি প্রতিকীও হতে পারে। অর্থাৎ ইলম তালাশে উস্তাদ ও শাগরেদের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকতে পারবেনা।
- জিবরিলের হাত রাখার বিষয়ে দুইটি মত আছে, একটি হলো তিনি নিজের উরুতে নিজেই হাত রেখেছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় শিক্ষার্থীকে এভাবে নম্রতার সাথে বসতে হয়। আর আরেকটি অর্থ হলো তিনি নবীজির উরুতে হাত রেখে বসেছিলেন। এর অর্থ হলো তিনি উত্তর পেতে উদগ্রীব ছিলেন। এমনটাই ঘটে থাকে যখন আমরা কাউকে খুব বেশি আপন মনে করে বিশেষ কিছু বলার ইচ্ছা করি। যেমন নবীজি (সঃ) একবার ইবনে উমরের কাঁধে হাত রেখে বললেন তোমাকে একটা বলিঃ কুন ফিদ দুনিয়া কান্নাকা গরিব আও আবিরি সাবিল। আরেকবার মুয়ায (রা) এর হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বললেনঃ মুয়ায, আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। আমি তোমাকে কি একটি সূরা শিখিয়ে দিবোনা?
- এসকল হাদিসের মূল বিষয় কিন্তু ছিলো কি সূরা শিখিয়েছেন বা কি বলেছেন তা, কিন্তু সাহাবীরা হাদিসগুলো বর্ণণার সময়ে রাসূলুল্লাহ কোথায় হাত রেখেছেন বা কাঁধে হাত দিয়েছেন এসবও আমাদের জন্য উল্লেখ করেছেন এ কথা বুঝাতে যে আসলে কথাগুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝাতে। এমনকি হাদিসগুলো বর্ণনার সময়ে সাহাবীরা হাতে কলমে দেখিয়ে দিতেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিভাবে তাদের কাঁধে বা হাতে হাত রেখেছিলেন।

- জিবরিল (আ) এর "আমাকে সংবাদ দিন" এই বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় আদতে তিনি রাসূলুল্লাহকে পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করছেন না, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান থেকে নিজেই উপকৃত হতে চাইছেন। বিদায় হজের ভাষণের পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলেছিলেন- আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আমার উপর অর্পিত বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। হাদিসে জিবরিলের ঘটনাটিও সেইরকম বার্তা পৌঁছে দেয়ার মতই ঘটনা।
- জিবরিল প্রশ্ন এমনভাবে করছিলেন যেন সকলের কাছে তিনি একজন অপরিচিত প্রমাণ হয়ে যান, এবং সেইসাথে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। তিনি এভাবে বলেন নি যে, আমাদেরকে বলুন ইসলাম কি? বরং বলেছেন আমাকে বলুন। অর্থাৎ এ কথার মাধ্যমে যাতে অন্যান্যরা ভাবতে পারে যে আগন্তুক ব্যক্তি নিজে না জানা বিষয়ে প্রশ্ন রাখছে।
- রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন তোমরা জ্ঞান অর্জন করো, এবং শিক্ষকের নিকট ভদ্রতা ও নম্রতা সহকারে অবস্থান করো। تعلموا العلم وتواضعوا لمن تعلم منه
- "মুহাম্মদ" নাম ধরে ডাকার একটি কারণ হচ্ছে- একদিকে জিবরিল হলেন ফেরেশতা জগতের রাসূল, আর মুহাম্মাদ (সঃ) মানব জগতের রাসূল। তাই এটি ছিলো সমান পদবীর ব্যক্তিত্বের প্রতি সমপর্যায়ের ব্যক্তির সম্বোধন।

নবীজি (সঃ) উত্তরে বললেন; 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ (সা:) তাঁর রসূল, এ ঘোষণা করবে, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমজানের রোজা রাখবে এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ্ব করবে- যদি তুমি সেখানে পৌঁছতে সমর্থ হও, উমরাহ করা, জানাবাতের গোসল করা, পরিপূর্ণভাবে অজু করা... এটাই হল ইসলাম'।

১. এই অংশ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে একজন মানুষ তাঁর জ্ঞান অর্জন শুরু করবে ইসলামের সংজ্ঞা দিয়ে, ইসলামকে জানবে, এরপর ঈমানকে জানবে। কারণ দ্বীনের মূলই হলো এই দুটি। তাই ইসলাম ও ঈমানের আরকান জানার মাধ্যমেই জ্ঞানের সূচনা হতে হবে। তাই জিবরিলের প্রথম প্রশ্নই ছিলো ইসলাম নিয়ে।

২. দ্বীনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিটি মূলনীতি যেমন জানা দরকার আছে একইভাবে প্রতিটি মূলনীতির বিস্তারিতও জানা দরকার। অন্যথায় পদস্খলন অনিবার্য। যেমন অতীতের মানুষ আল্লাহকে জানতো, কিন্তু বিশদভাবে না জানার কারণে শিরিকে লিপ্ত হয়েছে। একইভাবে ফেরেশতাদের অস্তিত্ব জানতো, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে না জানার কারণে তাঁদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে ধারণা করে নিয়েছিলো। নবীকে জানতো কিন্তু পরিষ্কার জানা না থাকায় নবীদেরকে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছিলো। তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) এখানে ইসলামের মূলনীতিকেও ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলছেন।

৩. আসলে রাসূল (সঃ) যা জানেন তা তো জিবরিলই উনার কাছে নিয়ে আসতেন। আর যে বিষয়ে তিনি প্রশ্ন করেছেন তা সাহাবীরা কিছু কিছু আগে থেকেই জানতেন, যেমন ঈমান, সালাত, যাকাত এসব। কিন্তু সবগুলো এক আলোচনায় বা এক তালিকায় কখনও শুনেননি। তাই এবার বিষয়টি নিয়মতান্ত্রিকভাবে সবার সামনে চলে এলো।

৪. আরেকটি বিষয় হলো, জিবরিল তো অনেক দূরের মুসাফির হিসেবে এসেছেন। এখন ইসলাম, ঈমানের সংজ্ঞা জানতে চাওয়ার ফলে উত্তরে সাহাবিদের জানা বিষয়ই উঠে আসার কারণে এই বিষয়টিও পরিস্কার হয়ে গেলো যে, দ্বীনের মৌলিক নীতি ও বিধান কাছের দূরের সকলের জন্যেই এক রকম। এখানে ভৌগলিক দূরত্বের কারণে হুকুমে কোনো তারতম্য হবেনা। এবং এই কথাও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জাগতিক দ্বীন। যা দূর দূরান্তের মানুষের জন্যেও সমান ও সাম্যের বার্তা বহন করে।

৫. জিবরিল (আ) এর উপর কি ইসলাম ফরজ? ফেরেশতাদের উপর ইসলামের বিধিবিধান মানা ফরজ নয়, কিন্তু আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান আনা ফরজ। এবং এক্ষেত্রে তাদের জন্য শরিয়ত হলো আল্লাহ যখন যা আদেশ করেন তা পালন করা। তবে তাঁরা জড়বস্তুর মত ইচ্ছাহীন নয়, তাদের এখতিয়ার আছে। তাই আল্লাহ ফেরেশতাদের প্রশংসা করেছেন কারণ তাঁরা আনুগত্য করে। বাধ্য হয়ে আনুগত্য করলে আল্লাহ তাদের এ কাজের প্রশংসা করতেন না। যেমন বদরের যুদ্ধে ফেরেশতারাও জিহাদ করেছেন। এই জিহাদ তাদের উপর ইসলামের বিধান হিসেবে আরোপ করা হয়নি, বরং আল্লাহর ভিন্ন একটি নির্দেশের কারণে তাঁরা সেই জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন। তাই হাদিসে জিবরিলে মূলত রাসুলুল্লাহ (সঃ) যে জিবরিলকে বলছেন- ইসলাম হলো তুমি সাক্ষ্য দেয়া... এই কথাটি মূলত জিবরিলের জন্য নয়, বরং কেয়ামত পর্যন্ত এই হাদিসের প্রতিটি শ্রোতার জন্য। মুহাম্মদ (সঃ) এর শরিয়ত মানা ফরজ করা হয়েছে কেবল মানুষ ও জ্বীনদেরকে। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন তিনি তাঁর ইবাদতের জন্য মানুষ ও জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন।

ইবনে জুযী আল-গরনাত্বী বলেন, ইসলামের শাব্দিক অর্থ হলো- আত্মসমর্পণ। শরীয়তের ভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায়- শারীরিক ও মৌখিক সম্মতির মাধ্যমে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ। আর শাব্দিকভাবে ঈমান হলো- সত্যায়ন। শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান হলো- আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রসূল, আখেরাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম ও ঈমান আলাদা বিষয়বস্তু।

ইসলাম ও ঈমান এই দুই পরিভাষা যখন একই বক্তব্যে বর্ণিত হয় তখন বুঝতে হবে এই দুইটি আলাদা অর্থ বহন করছে। আর যদি এ দুইটির শুধু যেকোনো একটি উল্লেখ হয় তখন বুঝতে হবে এর থেকে উভয়টিই উদ্দেশ্য।

ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি। কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত। কালেমা হলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।' এর অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল।

এই দুটি বাক্যের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমেই একজন কাফির মুসলিম হয়ে যায়। আর এই শাহাদাত স্বীকার না করার কারণেই আহলে কিতাবগণ সর্বসম্মতিক্রমে কাফের। ইসলামের এ সকল আমলগুলোর কোন একটিও যদি কেউ অস্বীকার করে সে কাফির হয়ে যাবে।

এজন্য এই দুই বাক্য ও সাক্ষ্য মিলে ইসলামের একটি একক রুকুন গড়ে উঠেছে। কারণ এই দুইটি বাক্যই একটি বিষয়ের দিকে চূড়ান্ত হয়। আর তা হলো 'ইবাদতের বিশুদ্ধতা'। কেননা এই দুই বিষয়ের সাক্ষ্য ও চর্চা ছাড়া

ইবাদত শুদ্ধ হবেনা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- যা দ্বারা ইখলাসের বাস্তবায়ন ঘটে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ- যা দ্বারা আনুগত্য ও অনুসরণের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এবং মুহাম্মদকে (সঃ) অনুসরণের সাক্ষ্যের মাধ্যমে এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘতে যে, তিনি যা বলেছেন তা সত্য বলে স্বীকার করা। তাঁর আনিত প্রতিটি সত্যকে অবশ্য-বিশ্বাস্য বলে মেনে নেয়া। নিজের কল্পনা, যুক্তি কিংবা ধারণাপ্রসূত মূল্যায়ন দিয়ে এর বিরোধিতার ধারেকাছেও না যাওয়া। কারণ নিজের বিবেক ও আবেগকে বশীভূত করা পূর্বক ইমান আনয়ন না করলে তা প্রকৃত ঈমানই না। এ বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ, হেদায়েতের কারণ নয়। যে মানুষ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর আনিত সত্যকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করবে সে স্বতস্ফুর্তভাবেই বলবেঃ সামি'না, আমান্না, সদাকনা। (শুনলাম, ঈমান আনলাম ও বিশ্বাস করলাম)।

- ইসলাম-ঈমান-ইহসান, এই তিনটির মধ্যে সবার নিচের ভিত্তি হলো ইসলাম। এর উপরের দুইটি না থাকলেও ব্যক্তির মধ্যে ইসলাম আছে বলা হবে। কিন্তু ইসলাম না থাকলে তাঁর মধ্যে ঈমান ও ইহসান নেই বলেই ধরা হবে। কারো মধ্যে ঈমান ও ইহসান নেই মানে এই না যে ইসলাম নেই, এমনও হতে পারে ব্যক্তির মধ্যে ইসলাম আছে কিন্তু ঈমান ও ইহসান নেই। একইভাবে কারো মধ্যে ঈমান না থাকলে স্বাভাবিকভাবে তাঁর মধ্যে ইহসান থাকবেনা। কিন্তু ইহসান না থাকলে ঈমান থাকা সম্ভব।
- যার মধ্যে ন্যন্যতম ইসলাম আছে বলে দাবি করা হবে তাঁর মধ্যে অবশ্যই নূন্যতম ঈমান ও নূন্যতম ইহসানও থাকা আবশ্যক। একভাবে যার মধ্যে নূন্যতম ঈমান আছে দাবি করা হবে তাঁর মধ্যে নূন্যতম ইসলাম ও নূন্যতম ইহসান থাকা আবশ্যক। তেমনিভাবে যার মধ্যে নূন্যতম ইহসান আছে দাবি করা হবে তাঁর মধ্যে নূন্যতম ইসলাম ও নূন্যতম ঈমান থাকা আবশ্যক। যেমন, ঈমানের একটি বিষয় হলো আল্লাহকে ভালোবাসা। এখন কারো মধ্যে ইসলাম থাকে বলে দাবি করা হয় তাঁর মধ্যে নূন্যতম আল্লাহর ভালোবাসা থাকা আবশ্যক। তাই কারো মধ্যে ইসলাম আছে কিন্তু ঈমান নেই বলতে আদতে পরিপূর্ণ ঈমান নেই বলেই বুঝানো হয়।

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভঃ

১. কালেমার মর্মকথা হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই—এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে মুখে উচ্চারণ করা এবং এর দাবি অনুযায়ী আমল করা। পাশাপাশি রাসুল (সা.)-এর নিয়ে আসা শরিয়ত মোতাবেক আমল করা। এবং তিনি যেসব বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকা।

- **কালিমাকে বলা হয় ইখলাসের বাক্য। অর্থাৎ তাওহীদ প্রমাণ করতে ইখলাস ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ নেই। এই কালিমার প্রথম অংশ "লা ইলাহা" হলো সমস্ত বাতিল ইলাহকে নাকচ করার শর্ত, শেষ অংশ "ইল্লাল্লাহ" হলো চিরসত্য ইলাহ আল্লাহুর অস্তিত্ব স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা।**

- **এই কালিমার অর্থের মধ্যে আছে আল্লাহর ভালবাসা ও আনুগত্য সবকিছুর উর্ধে রাখা। সুতরাং আল্লাহকে একক সত্য ইলাহ মেনে সাক্ষ্য দেয়ার মানে হলো তাঁর অস্তিত্ব, গুণাবলি, তাঁর কর্ম ও আমাদের ইবাদত সবকিছুতেই তাঁকে একক হিসেবে সাক্ষ্য দেয়া।**

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্য দাবী করে- আল্লাহ ও রাসূলের আনিত বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। তাঁদের নির্দেশাবলীর অনুগত হওয়া। নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কতা থেকে বেঁচে থাকা। তাঁদের বিধানকৃত পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় ইবাদত পালন না করা। এই দুই বাক্যের সাক্ষ্য ইবাদতের দুই প্রধান শর্তকে একত্রিত করেছে। এক, আল্লাহর প্রতি ইখলাস। দুই, রাসূলের দেখানো পদ্ধতির অনুসরণ। কারণ যে সাক্ষ্য দিবে- আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নাই, সে অবশ্যই আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হবে। আর যে সাক্ষ্য দিবে- মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সে অবশ্যই তাঁকে ছাড়া অন্য কারো পথ অনুসরণ করবেনা।

- "ইসলাম" এবং "ঈমান" শব্দদ্বয় যখন একসাথে একই বাক্যে উল্লেখ হবে তখন প্রতিটির আলাদা অর্থ হবে। যখন কোন একটি উল্লেখ হবে তখন একটি অপরটির অর্থ বহন করবে। আরবী ভাষায় এই ধরণের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন "তাকওয়া" ও "বিরর" শব্দদ্বয়, ইসম ও উদওয়ান শব্দদ্বয়, ফকির ও মিসকিন শব্দদ্বয়। যেমন সূরা হুজুরাতের শেষে আল্লাহ এসেছে- তোমরা বলোনা যে আমরা ঈমান এনেছি, বরং বলো আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।
- শাহাদাত অর্থ জানা বা মনেপ্রাণে জ্ঞাত হওয়া। ইলাহ শব্দের অর্থ মা'বুদ। মুহাম্মাদ রাসুলূল্লাহ (সঃ) সাক্ষ্য দেয়ার মানে হলো তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস করা, তাঁর আনিত আদেশের অনুগত হওয়া, তাঁর আনিত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা। তাই এই জ্ঞান শাহাদাতের শর্ত। এ কারণে শুধুমাত্র বিশ্বাসটাই যথেষ্ট রাখা হয়নি, বরং মুখে উচ্চারিত করে সাক্ষ্য দেয়াটা জরুরি রাখা হয়েছে যাতে জ্ঞান নিশ্চিত হয়। আর শাহাদাত অর্থ অন্তরে জ্ঞাত বিষয়ে সম্পর্কে মুখে উচ্চারণ করে জানানো। এ কারণেই কোনো ঘটনার সাক্ষী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে ঘটনা দেখেছে এবং তা জবানবন্দি দিয়েছে।
- কোরআনের যত আয়াতে ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু এসেছে যব কয়টির অর্থ একইসাথে ঈমান ও ইসলাম।
- সাহাবীরা বিভিন্ন সময় রাসুলুল্লাহকে (সঃ) ইসলাম কি জিজ্ঞেস করেছেন। একেক সময় তিনি ইসলামের একেক বিষয়ের কথা বলেছেন। যেমন সচ্চরিত্র হওয়া, উত্তম ভাষী হওয়া, অভাবীকে খাওয়ানো।
- কেউ যদি উচ্চারণে অক্ষম হয়, তাঁর সাক্ষ্য কিভাবে গ্রহণ হবে? এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে একজন মানুষ মনেপ্রাণে ঈমান রাখে কিন্তু মূক ও উচ্চারণে জড়তার কারণে সাক্ষ্য দিতে পারছেনা সেক্ষেত্রে তাঁর ইশারার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ এক মূক ও বধির দাসিকে এভাবে জিজ্ঞেস করার পর সে ইশারা করে আকাশের দিকে দেখিয়েছিলো। আর যদি এমন হয় যে মুখে উচ্চারণের কথা একজন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার পর জানতো না। ধরুন কোন হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করলো। তাঁর আশেপাশের মানুষ তাঁকে শাহাদাত উচ্চারণের বিষয়টি বললো না, সেও এ বিষয়ে জানেনা। এভাবেই সে ইসলামের সব আহকাম মেনে চলতে চলতে একদিন মারা গেল। এক্ষেত্রে সে মুসলিম সাব্যস্ত হবে কিনা। অধিকাংশ আলেমদের মতে সে মুসলিম সাব্যস্ত হবে কারণ তাঁকে কেউ সাক্ষ্য দেয়ার আহ্বান জানায়নি তাই সে বলেনি। অন্যথায় তাঁর মধ্যে ইসলাম ও ঈমান ছিল।

২. সালাত ইবাদতসমূহের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি এমন এক ইবাদত, যা বিশেষ কিছু কথা ও কর্মকে শামিল করে, 'আল্লাহু আকবার' দিয়ে সালাত শুরু হয় এবং 'আসসালামু আলাইকুম' বলে শেষ হয়।

- **প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা সবার জন্য ফরজ। হাদিসে সালাতকে ইসলামের মূল খুটি বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই সালাতের ব্যাপারেই সর্বপ্রথম হিসাব নেয়া হবে। এটিই একজন মানুষের ইসলামের প্রকাশ্য মানদন্ড। রাসূলুল্লাহ'র (সঃ) শেষ অসিয়তের একটি ছিলো এই সালাত। এই সালাতের হিসাব নিয়েই মানুষ হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম রব্বের সামনে দাঁড়াবে। তাঁর মুখোমুখী হবে। প্রথম সাক্ষাৎ হবে এই সালাতের হিসাব নিয়েই।**
- **সালাত কায়েম ২ প্রকার। প্রকাশ্য কায়েম যা সালাতের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, শর্ত, মুস্তাহাব রুকুন, ওয়াক্ত, ইত্যাদিকে বুঝায়। আর অপ্রকাশ্য কায়েম অর্থ খুশু-খুজু বজায় রাখা।**
- ইকামাতুস সালাত অর্থ সঠিক পদ্ধতিতে সঠিকভাবে সালাত আদায় করা। কেউ যদি আসরের নামাজ সূর্য ঢলে পড়ার পর আদায় করে তাহলে তা ইকামাতুস সলাত হলো না। আদায় হতে পারে, তবে ইকামাত না। এই সালাতকে রাসুলূল্লাহ (সঃ) মুনাফিকদের সালাত বলেছেন।
- একইভাবে ইকামাতুস সালাত অর্থ জামাআতের সাথে আদায় করা।
- সালাত ও অন্যান্য আমলকে ইসলামের পরিচয়ের ভিতর অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হলো ইসলামের মধ্যে কেবল অন্তরের বিশ্বাস কিংবা মুখের সাক্ষী যথেষ্ট না। বরং এতে দৈহিক, আর্থিক আমলও অন্তর্ভুক্ত আছে।
- অসংখ্য হাদীসে সালাতকে ইসলাম ও কুফরির পার্থককারী হিসেবে বলা হয়েছে। তাই ইচ্ছাকৃত সালাত পরিত্যাগ করা কুফরের সমার্থক। আর যদি সালাতের প্রয়োজনীয়তাকে অসীকার করে তাহলে সে নিশ্চিত কাফের।

৩. জাকাত শব্দের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, বেশি হওয়া। নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত সম্পদ ব্যয় করার নাম জাকাত। কোরআনে বহু স্থানে সালাতের সঙ্গে জাকাতের আলোচনা হয়েছে।

- **আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নতে জাকাত হলো সালাতের পাশাপাশি অবস্থান করা স্তম্ভ। এটি আর্থিক ইবাদত। এই ইবাদত পালনের মাধ্যমে ধনীর যেমন নিজের দায়িত্ব আদায় হয়, তেমনি গরীবের আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জিত হয়।**

- যাকাত আদায়ের অর্থ হলো, নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পদ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করে ইবাদত পালন করাকে যাকাত বলে।
- হাদিসে যাকাতের প্রতি ঈমানের কথা বলা হয়নি, তাই কেবল যাকাতের বিধানকে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট হবেনা। বরং আদায় করা ফরজ।
- সম্পদের যাকাত বের না হলে সেই সম্পদে নাপাকি রয়ে যায়।
- যাকাত হয়ে থাকে স্বর্ণ রূপায়, ব্যবসায়ী পণ্যে, গবাদি পশুতে আর শস্যে। এক বছর অতিবাহিত না হলে যাকাত ফরজ হয়না। কেবলমাত্র শস্যের ক্ষেত্রে সময়সীমা হলো সশ্য ঘরে তোলার দিন। প্রতিটি সম্পদের জন্য আলাদা আলাদা নিসাব আছে।
- আমাদের দেশের অধিকাংশ নারীরা স্বর্ণালংকার কিনেন সঞ্চয় হিসেবে, পরিধানের জন্য না। এ ধরনের স্বর্ণে সর্বসম্মতক্রমে যাকাত আসবে। এছাড়া হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ব্যবহারের স্বর্ণেও যাকাত ফরজ হবে।
- আর কিছু ব্যবসায়ী আছেন যাদের বেশ কিছু ঋণ আছে দাবি করে যাকাত দেননা। তাদের ক্ষেত্রে বিষয় হলো যদি সম্পদের পরিমাণ কর্জের চেয়ে বেশি হয় তাহলে তো অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। আর কর্জের চেয়ে সম্পদের নিসাবের পরিমাণ যদি কম হয় তখন দেখতে হবে সেই কর্জের মেয়াদ কতদিনের। যদি এমন হয় যে স্বল্প সময়ের মেয়াদের কর্জ। যেমন বছরখানেক তাহলে বুঝতে হবে ব্যবসায়ী সেই কর্জ শীঘ্রই পরিশোধের সামর্থ রাখেন। তাই যে পরিমাণ সম্পদ আছে সে অনুপাতেই যাকাত দেয়ার চেষ্টা করবে।
- আর যদি আপনিই কাউকে নিসাব পরিমাণ সম্পদ ধার দিয়ে থাকেন। সেই ব্যক্তি যদি সাবলম্বী হয় তাহলে আপনাকে কিংবা তাঁকে যাকাত আদায় করে দিতে হবে সেই মালের। আর যদি ঐ ব্যক্তি এখনই ফিরিয়ে দিতে পারবে এমন অবস্থার না হন তাহলে আপনাকে ঐ সম্পদের যাকাত দিতে হবেনা। যখন সে ফেরত দিবে তখন সেই বছরের যাকাত আদায় করে দিলেই হবে ইন শা আল্লাহ।
- আর শস্যের ক্ষেত্রে যদি তা নিজে নিজেই তা উৎপন্ন হয়ে থাকে। এতে সেচ দিতে না হয় তাহলে এর যাকাত হলো শতকরা ১০ পার্সেন্ট। যদি নিজের সেচ দিতে হয়, খরচ করতে হয় সেচের জন্য তখন যাকাত আসবে শতকরা ৫ পার্সেন্ট।
- ইবাদতের জগতে সর্বোচ্চ দোইহিক ইবাদত হলো সালাত। আর সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক ইবাদত হলো যাকাত।
- কিছু আলেমদের মতে, যাকাত ছাড়াও অল্প কিছু দান সদকা করাও প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ।

৪. রোজার আরবি হলো সিয়াম। সিয়ামের শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম রোজা।

- রমজান হলো এমন এক মাস যা আসার ছয় মাস আগে থেকেই প্রস্তুতি নেয়া হতো রাসূলুল্লাহ'র যুগে। এটি এমন এক ইবাদত যা অন্তর ও দেহকে একই সাথে পরিশুদ্ধ করে। এটি এমন এবাদত যার নির্দিষ্ট বিনিময় নেই। এর বিনিময় কেবল আল্লাহ নিজেই দিবেন। তাই এই রুকনের গুরুত্ব অপরিসীম। যা তাকওয়া অর্জনের বিশেষ পাথেয়।

পুরো রমজান মাস সিয়াম পালন করা ফরজ। এ ছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে নফল রোজা রয়েছে।

  - হাদিসে রমজানের সাওম বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় রমজানের সাওমই ফরজ। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিটি ফরজের অপর একটি পিঠ আছে। যেমন ফরজ নামাজের পাশাপাশি ইসলামে নফল ও সুন্নত সালাত আছে। যাকাতের পাশাপাশি সদকা আছে। সাওমের পাশাপাশি নফল সাওমও আছে। এটাই ইসলামের একটি চমৎকার সৌন্দর্য। তেমনি হজের পাশাপাশি আছে উমরাহ।
  - আগের দুইটি ফরজ ছিলো আমল করার বিষয়ে। সাওম হলো পরিত্যাগের করার ইবাদত। অর্থাৎ পানাহার ও সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা। এবং এতে অবশ্যই নিয়ত থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫. হজ শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা। নির্ধারিত শর্তসহ নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদত করার জন্য মক্কায় গমনের ইচ্ছা করাকে হজ বলে। সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর গোটা জীবনে একবার হজ করা ফরজ।

- হজের ব্যাপারে বলা হয়েছে এর বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। হজ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রকাশ্য ও অদৃশ্য ইবাদত। এই ইবাদতটিকে আল্লাহ ইসলামের রুকনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার পিছনে রহস্য হলো- প্রতিটি মুসলিমকে আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান হওয়ার অনুপ্রেরণা দেয়া। একইভাবে যাকাত। মুসলিম মাত্রই অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হবে এটাই এইসকল মৌলিক রুকনের পিছনে থাকা নিহিত উদ্দেশ্য।
- ইচ্ছাকৃত হজ, সাওম, যাকাত কিংবা সালাত ত্যাগ করার হুকুম একই। হজের সামর্থ হওয়ার সাথে সাথে আদায় করা ফরজ না কি বিলম্ব করার সুযোগ আছে? সোজা কথা হলো তাৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজিব। কোনো উজর ছাড়া দেরী করলে গোনাহগার হবে।
- উমরাহ আদায় করার মাধ্যমে হজ আদায় হয়না। উমরাহ করা ওয়াজিব, কিন্তু হজ হলো ফরজ। উমরাহ ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব যে মক্কায় যাওয়ার সামর্থ রাখে।

ইসলামের এই পাঁচ রুকন কি কেবল মুসলিমদের উদ্দেশ্যে নির্দেশিত? এই কথার উপর সকল উলামাগণ একমত যে, কালিমা বা শাহাদাতের সাক্ষ্য দেয়ার দাবি মুসলিম ও কাফির সবার দিকেই দেয়া হয়েছে। বাকি চার রুকন সালাত, যাকাত, সাওম ও হজের ব্যাপারে ভিন্নমত থাকলেও সঠিক কথা হচ্ছে, কাফেররাও এই ফরজ আদায়ের আদেশের অন্তর্ভুক্ত আছে। তবে শাহাদাত আদায় করা ছাড়া এসব আদায় করলেও কোনো কাজে আসবেনা।

- হাদিসের এই অংশে মূলত দ্বীনের বাহ্যিক ও প্রকাশ আমলগুলোকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। যাকে ইসলাম বলে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। বিষয়টি বুঝা যায় শেষে অজু, গোসল ও ওমরার সংযুক্তির মাধ্যমে। এভাবে সব ধরণের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত অন্তর্ভুক্ত। এমনকি হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকাও ইসলামের অংশ। আর পরের অংশে ঈমানকে পরিচয় করা হয়েছে যা দ্বীনের অপ্রকাশ্য ও অন্তরের আমল।

তিনি বললেন; ‘ঠিক বলেছেন’। তাঁর প্রশ্নোত্তরে আমরা আশ্চর্য বোধ করলাম। (অজ্ঞলোকের ন্যায়) প্রশ্নও করেছেন আবার (বিজ্ঞের ন্যায়) তার সত্যায়নও করছেন। অত:পর জিজ্ঞাসা করলেন; ‘আমাকে বলুন, ঈমান কাকে বলে?’ রাসূলুল্লাহ উত্তর করলেন, ‘আল্লাহতে বিশ্বাস করবে এবং তার ফেরেশতাগণে, তার কিতাব সমূহে, তার নবী-রসূলগণে ও পরকালে বিশ্বাস করবে এবং তকদীরে, তার ভালোতে ও মন্দতে বিশ্বাস করবে’।

- **কেউ কোন কিছু জানতে চেয়ে উত্তর পেয়ে এর সত্যায়ন করার অর্থ হলো এই তাঁর আগে থেকেই জানা আছে, আর কেউ এমনটা দেখে অবাক হওয়ার অর্থ হলো ঘটনা বা এই প্রশ্নের উত্তর তাঁর জানা ছিলোনা। কিন্তু যখন তাঁরা জানতে পারবেন যে ইনি জিবরিল তখন এই আশ্চর্যবোধ কেটে যাবে।**
- **মানুষ যখন কিছু জানতে চেয়ে পরিতৃপ্তির উত্তর পায় তখন সে আরো জানতে চায়। মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম নতুন মুসলিম হয়ে যখন মসজিদে আসলেন, ইসলাম সম্পর্কে কিছুই তখন জানেন না। নামাজরত সাহাবীদেরকে তিনি জিজ্ঞেস করতে লাগলেন তোমরা কত রাকাত পড়লে? কোনো উত্তর না পেয়ে তিনিও নামাজে যোগ দিলেন। হঠাৎ একজন হাচি দিলে তিনি ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে উঠলেন। লোকেরা আড়চোখে তাকাতে লাগলো। তিনি সবার উদ্দেশ্যে বলে বসলেন- ওহে সন্তানহারা মায়ের পুত্ররা! এভাবে তাকাচ্ছো কেনো?! এবার সবাই হাত দিয়ে উরুতে থাবা মেরে আওয়াজ করে সতর্ক করতে লাগলেন। এতক্ষণে মুয়াবিয়ার ভয় লাগলো। তিনি এবার চুপচাপ নামায পড়তে লাগলেন। নামাজ শেষে রাসূলুল্লাহ তাঁকে কাছে ডাকলেন। মুয়াবিয়া বলছেনঃ**

আল্লাহর শপথ আমি এমন শিক্ষক আর পাইনি। তিনি আমাকে বকলেনও না, ধমকও দিলেন না। বরং বললেন, হে আমার আরব ভাই। নামাজে দুনিয়াবি কথা বলা যায়না, এটি কেবল আল্লাহর যিকির, তাসবীহ, তাহমিদ ও তিলাওয়াত। এমন চমৎকার শিক্ষা ও উত্তর পেয়ে মুয়াবিয়া আর অনেক প্রশ্ন করলেন। সেসবের উত্তরও খুব সন্তুষ্ট করলো তাঁকে।

- **একইভাবে জিবরিল যখন প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেলেন তিনি আরো প্রশ্ন করলেন। এভাবে তিনি মোট পাঁচটি প্রশ্ন করেছিলেন। ইসলাম কি? ঈমান কি? ইহসান কি? কেয়ামত কবে? কেয়ামতের আলামত কি?**

দ্বীনের প্রকাশ্য ও অদৃশ্য দিক আছে; এর প্রকাশ্য দিকটি হলো ইসলাম। আর তা হলো আত্মসমর্পণ, আত্মনিয়োগ ও আল্লাহর আদেশ কায়মনোবাক্যে পরিপূরণ করা। আর দ্বীনের অদৃশ্য দিক হলো ঈমান, আর তা হলো- আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রসূল, আখেরাতের প্রতি পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। আর ইহসান হলো এই দুইটির সমন্বয়ে সৃষ্ট ফলাফল। তা হলো আপনের উপস্থিতিতে নিজের অন্তরকে উপস্থিত রাখা, {إياك نعبد وإياك نستعين}এটাই সিরাতে মুস্তাকীমের পথের দিশা যার বেশ কিছু স্তর আছে।

হাদীসে জিবরিল আকীদা নিয়ে কথা বলেছে। মূলত আকীদা নিয়ে বেশি কিছু বলার দরকার নেই। ইসলামে আকীদা আসলে খুবই সাবলীল ও সংক্ষিপ্ত। আকীদার যে কিতাব দেখা যায় এর অধিকাংশই বাতিল ফিরকাকে রদ্দ করে। মূল আকীদার আলোচনা একেবারেই নাতিদীর্ঘ। আকীদার মূলনীতিগুলো গ্রহণ করা হয়েছে কোরআন ও হাদীস থেকে। এই আকীদা কিছু বাক্য সর্বস্ব সাক্ষ না। বরং আকীদা হলো সেটা যেটার প্রভাব চরিত্র ও আমলে দেখা যাবে। আল্লাহ বলেনঃ

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

"সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগণের উপর" (বাকারা-১৭৭)

এবং সূরা বাক্বারার শেষ আয়াত থেকে ঈমানের বাকী বিষয়গুলো প্রমাণিত হয়।

সাহাবী হারিসাকে (রা) জিজ্ঞেস করা হল- কেমন আছো? তিনি বললেন আমি বিশুদ্ধ মুমিন হয়ে সকাল করেছি। অনেক মানুষ দেখবেন আকীদা নিয়ে দীর্ঘ আলাপ করে, কিন্তু যার জন্য আকীদা সেই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নামাজ পরেনা। ইমাম মালেককে যখন জিজ্ঞেস করা হলো- ইস্তিওয়া কি, তিনি ঘামতে শুরু করলেন। আল্লাহর এই শান নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে এটা ভেবে তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে গেলেন। ইমাম কারখীর বিষয়ে লোকেরা নালিশ দিল ইমাম আহমদকে যে তাঁর ইলম দুর্বল। ইমাম আহমদ বললেন সে কি দ্বীনদার নয়? ইবাদতগুজার

নয়? লোকেরা বলল- হ্যাঁ। তিনি বললেন- এটাই তো তাঁর ইলমের কারণে হয়েছে। ইলম তো সেটাই যেটা আমলকে প্রভাবিত করে।

আকীদার শাব্দিক অর্থ হলো- বন্ধন। পারিভাষিক অর্থ হলো- ফিকহুল আকবার। ফিকহুল আসগর হলো আমল। আর ফিকহুল আকবার হলো আকীদা বা ঈমান। যার বড় ফিকহ ঠিক আছে তাঁর আমলের মূল্য আছে। আল্লাহ কোরআনে কাফেরদের আমলকে মরীচিকা বলে অভিহিত করেছেন। একইভাবে মক্কায় অনেক কাফের ছিলো যারা ভালো কাজ করত কিন্তু ঈমান আনেনি, তাঁদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে রাসুল বললেন- তাদেরকে ক্ষমা করা হবেনা, তারা কোনোদিন "ইয়া রব্ব আমার পাপ ক্ষমা করুন" বলেনি।

ঈমানের গুরুত্বঃ

হাদিসে উল্লেখিত বিষয়গুলো ঈমানের মূল স্তম্ভ। উসূলুল ঈমান। অন্যথায় ঈমানের কাঠামো পরিপূর্ণ দ্বীনকে শামিল করে। নামায, যাকাত, রোজা, হজ, শাহাদাত, জিহাদ সহ দ্বীনের সমস্ত আমল ও ইয়াকীনকে অন্তর্ভূক্ত করে। একইসাথে দ্বীনের সকল নির্দেশনা ও নিষেধাজ্ঞাকেও নিহিত রাখে। এসব কিছুই ঈমানের অঙ্গ। যেমনটা নবীজি (সঃ) বলেছেনঃ ঈমান হলো সত্তরের অধিক শাখা – অথবা ষাটের অধিক শাখার- নাম। এর সর্বোত্তম শাখা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এবং নূন্যতম শাখা হলো পথের বাধা দূর করা। লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা।

সন্দেহ নেই, আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো ঈমান। আবু যার রা: বর্ণনা করেছেন, এক সাহবি একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন্ আমলটি সর্বোত্তম? জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর পথে জিহাদ। (সহিহ মুসলিম)

হিদায়াত এবং ইহ ও পরকালীন সুখ-সৌভাগ্যের কারণ হলো ঈমান। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

"অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন"। (সুরা: আন'আম, আয়াত: ১২৫)

ঈমানদারকে তার ঈমান আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে। (সুরা: আ'রাফ, আয়াত: ২০১)

আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার পূর্বশর্ত ঈমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। (সুরা: যুমার, আয়াত: ৬৫)

সুতরাং খাঁটি ঈমানের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমলে বরকত দান করেন এবং দু'আ সমূহ কবুল করেন। সুতরাং ইমানের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঈমানের ৩টি মূলনীতিঃ

কবরে তিন প্রশ্ন-পরকালের প্রথম ধাপ হলো কবর। কবরে বান্দাকে তিনটি বিশেষ প্রশ্ন করা হবে। বারা বিন আজেব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, কবরে মানুষকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে।

এক. তোমার রব কে?

দুই. তোমার দ্বিন কী?

তিন. এই লোকটি কে ছিলেন, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল? কবরবাসী যদি মুমিন হয়, তাহলে এসব প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিতে পারবে। আর যদি কাফির হয়, তাহলে বলবে, আফসোস! আমি কিছুই জানি না।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৪৫৩; তিরমিজি, হাদিস : ৩১২০)

ঈমানের মূলশর্ত ৩টিঃ

(১) মুখে স্বীকার করাঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সবকিছুর মালিক। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আমাদের যা কিছু আদেশ করেছেন তা নিঃসন্দেহে পালন করা এবং যা নিষেধ করেছছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং রাসূল (সা) হাদিসে আমাদের যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথ অনুসরন করাই হলো ইমান। এগুলো সর্বপ্রথম মুখে স্বীকার করতে হবে।

(২) অন্তরে বিশ্বাস করাঃ উপরোক্ত বিষয়গুলো মুখে স্বীকার করার পাশাপাশি অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। মুখে স্বীকার করে বিশ্বাস করলে মুনাফিক হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন," তারা যখন ঈমানদার

লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু নিরিবিলিতে যখন তারা তাদের শয়তানদের সঙ্গে একত্রিত হয়, তখন তারা বলেন, আসলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি, আর উহাদের সঙ্গে আমরা শুধু ঠাট্টাই করি মাত্র। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৪)"

(৩) তদানুযায়ী আমল করাঃ উক্ত বিষয়গুলো মুখে স্বীকার করা, অন্তরে বিশ্বাস করার পাশাপাশি সেই অনুযায়ী কাজও করতে হবে। আমি যে ইমান এনেছি তার প্রতিফলন দেখাতে হবে।

উপরেরর ৩টি শর্ত পূরণ করলেই তবে কাউকে পূর্ণ ঈমানদার বলা যাবে।

ঈমানের স্তম্ভ বা হাকিকত বা স্বরূপ বা রুকন ৬টিঃ

(১) আল্লাহঃ ঈমানের ছয়টি মৌলিক স্তম্ভের প্রথম এবং প্রধান স্তম্ভ হলো মহান আল্লাহর ওপর ঈমান তথা বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহর ওপর ঈমান আনার অর্থ এ কথা বিশ্বাস করা, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁর কোনো কিছুর অভাব নেই। তিনিই সবার সব অভাব পূরণকারী। তিনি কারো বাবা নন, ছেলেও নন। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। একমাত্র তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা, বিধানদাতা। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই। তিনি ছাড়া অন্য সব কিছুই ক্ষয়শীল ও ধ্বংসপ্রাপ্ত; কিন্তু তাঁর ক্ষয়ও নেই, ধ্বংসও নেই। সব কিছুর ওপরই তাঁর ক্ষমতা চলে। কিন্তু তাঁর ওপর কারো ক্ষমতা চলে না

- ঈমানের বাকি রুকনগুলোর মূল উৎস হলো আল্লাহর উপর ঈমান আনা। এই কারণে হাদিসে বাকি রুকনগুলোকে আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নের উপর সম্বন্ধিত করা হয়েছে। আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ হলো আল্লাহর তিনটি প্রধান ক্ষমতার উপর ঈমান আনা।
- আল্লাহর উপর বিশ্বাস মূলত আল্লাহর অস্তিত্বের বিশ্বাস। আল্লাহর অস্তিত্বে অহী, যুক্তি, ইন্দ্রিয় ও আলামতসমূহ প্রমাণ করে। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর রুবুবিয়াতে বিশ্বাস করা। এর অর্থ হলো তাঁর কাজের ক্ষেত্রে তিনি একক এই বিশ্বাস করা। তৃতীয়ত, আল্লাহর ইবাদতে বিশ্বাস করা। এর অর্থ হলো আমাদের ইবাদত কেবল তাঁর জন্যেই হবে। এরপর আছে আল্লাহর নামসমূহ গুণে বিশ্বাস করা। আল্লাহর সাধারণত নিরান্নব্বই নাম রয়েছে। কিন্তু এর বাহিরেও আরো নাম আছে যা আমরা জানিনা। কিছু নাম আছে যা কেবল ফেরশতারা জানেন। আর কিছু নাম আছে যা আল্লাহ হাশরের ময়দানে নবীকে (সঃ) শিখিয়ে দেখেন সুপারিশ শুরু করার জন্য।
- আল্লাহকে আমাদের বানানো নামে ডাকা বৈধ না। যেমন যদি বলি তিনি বিশ্ব প্রকৌশলী। বা যদি বলি তিনি কাফেরদের ঘৃণাকারী... এসব অবৈধ।

- আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে ইলহাদ হারাম। ইলহাদ হলো- বাতিল দেবদেবীকে আল্লাহর বিভিন্ন নামে ডাকা। বা আল্লাহ যে নামে নিজেকে পরিচয় দেননি, বা আমাদের নবী যে নামে আল্লাহকে ডাকেননি সেসব নামে ডাকা। অথবা আল্লাহ নিজের জন্য যে নাম ঠিক করেছেন তা অস্বীকার করা। কিংবা আল্লাহর যে নাম আছে তাঁর অর্থের বিকৃতি করা। অথবা এমন না বাচক নাম দেয়া যা আল্লাহর সাথে যায়না। যেমন কোন বাদশাকে যদি বলেন যে আপনি বাবুর্চি নন, দর্জি নন, কামলা নন... এসব কখনও বাদশার প্রশংসা হতে পারেনা। তবে এমন যদি বলেন যে আপনি প্রজাদের মত নন। তাহলে তা ঠিক আছে।
- আল্লাহর সিফাত দুই প্রকার, একটি স্বত্ত্বাগত যেমন আল্লাহর হাত, পা ইত্যাদি। আরেকটু ক্রিয়াগত, যেমন তাঁর সন্তুষ্টি, সৃষ্টি ইত্যাদি।

(২) ফেরেশতাঃ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হলো, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। তাঁরাও আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। কিন্তু মানুষের মত তারা ছেলে বা মেয়ে নয়। ইন্দ্রিয়জাত কোনো তাড়না নেই। আল্লাহ তাঁদের যা আদেশ করেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘ তারা ছেলেও নয় মেয়েও নয়। বরং ফেরেশতারা তো আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তারা আগ বাড়িয়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করে।’ (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ২৬-২৭)

- ফেরেশতা এবং জ্বীন মানব আকৃতি ধারণ করতে পারে। যেমন আমরা আবু হুরাইরা (রা) এর ঘটনা থেকে জানতে পারি তাঁর খেজুর চুরি করে খাওয়ার জন্য এক জ্বীন মানুষের আকৃতি ধারণ করে আসতো।
- আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে তাঁরা যেকোনো আকৃতি ধারণ করতে পারেন। যেমন এই হাদিসে জিবরিল (আ) একজন ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে এসেছেন।
- জিবরিল (আ) দায়িত্বের দিক দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছেন। তা হলো আল্লাহর বার্তা বা অহী রাসূলগণের কাছে পৌঁছে দেয়া। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিবরিলকে দুইবার প্রকৃতরূপে দেখেছেন। একবার জমিনে, আরেকবার আসমানে।
- জমিনে যেবার দেখেছিলেন সেবার ছিলো হেরা গুহার ঘটনা, ছয়শ দিগন্তবিস্তৃত ডানা সহ তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। আসমান জমিনের সবকিছুই যা ঢেকে দিয়েছিলো। দ্রুতগতির জন্যে এ ধরণের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে ফেরেশতাদেরকে। দ্বিতীয়বার দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনতাহার নিকট।

(৩) আসমানি কিতাবঃ আল্লাহ তাআলা মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য নবী-রাসুলদের ওপর বিভিন্ন আসমানি কিতার নাজিল করেছেন। সেই কিতাবগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও ঈমানের মৌলিক স্তম্ভ। আলাহ তায়ালা মোট ১০৪ খানা আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন। ৪খানা বড় এবং ১০০ খানা ছোট। এগুলো মোট ৮ জন নবির উপর নাযিল হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, "আপনি বলুন, আল্লাহ যে কিতাব নাজিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি।' (সুরা : শুরা, আয়াত : ১৫)

- সর্বশেষ কিতাব আল-কোরআন চূড়ান্ত সংবিধান যার মাধ্যমে আগের সকল কিতাবকে রহিত করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি এই কোরআন হলো মুজিযা, এটির প্রতিটি বিধান ফরজ। কোরআনের কোন একটি অংশও যদি কেউ অস্বীকার করে সে কাফির। কেউ এর মধ্যে কমতি আছে বলে দাবি করে, বা এর মধ্যে সংযোজন করার দাবি করে সেও কাফির। এই কোরআন লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে, এবং মুসলিমদের অন্তরে।

(৪) নবী রাসুলঃ : আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে অনেক নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। যাদের উপর আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছে তারা রাসূল। আর যাদের উপর নাযিল হয়নি তারা নবি। নবিরা পূর্ববর্তী রাসুলদের দেখানো পথে দাওয়াত দিতেন। সেই নবি ও রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও ঈমানের মৌলিক স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত। দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতির জন্য একজনকে রাসুল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের এক আল্লাহর ইবাদত করার এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর ইবাদতকে অস্বীকার করার দাওয়াত দেন। সব রাসুল সত্যবাদী, সত্যায়নকারী, পুণ্যবান, সঠিক পথের দিশারি, তাকওয়াবান ও বিশ্বস্ত। নবী-রাসুলরা মাসুম তথা নিষ্পাপ। আল্লাহ তাঁদের যা কিছু দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁরা তা পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। কোনো অংশ গোপন বা পরিবর্তন করেননি। নিজে থেকে কোনো সংযোজন বা বিয়োজন করেননি। আল্লাহ বলেন, '...রাসুলদের দায়িত্ব তো শুধু সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেওয়া।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৩৫)

- সমস্ত নবী রসূলদের উপর ঈমান আনা ফরজ, তাদের সকলের পরিচয় জানা থাক বা না থাক। কোন একজন নবীকে অস্বীকার করা সমস্ত নবী রসূলকে অস্বীকার করার সমান। তাই ইহুদি নাসারারা মুহাম্মদকে (সঃ) অস্বীকার করার ফলে তাদের নিজেদের নবীকেই অস্বীকার করে। আমরা বিশ্বাস করি মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ নবী এবং খাতামুন নাবিয়্যিন।

(৫) তাকদিরে বিশ্বাসঃ তাকদিরে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাকদিরের শব্দমূল হচ্ছে কদর। এর অর্থ হচ্ছে পরিমাণ নির্ধারণ, পরিমাপ, পরিমিতি, মূল্যায়ন, নির্দিষ্ট সীমা, মূল্য নিরূপণ, অদৃষ্ট, নিয়তি, ভাগ্য ইত্যাদি। তাকদির হচ্ছে আল্লাহর বিশ্বজনীন নিয়মনীতি। এ নিয়মনীতি ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার অধীনে বিশ্বজগৎ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন, এ চেতনা লালন করা এবং তাঁর বিধিব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকার মধ্যেই শান্তি ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। কোনো কল্যাণকর কিছু ঘটলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। আর অকল্যাণকর কিছু ঘটলে তাওবা-ইস্তেগফার এবং ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সেই সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য পাওয়ার ইচ্ছা প্রবল করতে হবে এবং তদানুযায়ী আমল বা চেষ্টা-তদবির করে যেতে হবে।

- তাকদীরে বিশ্বাস করা ছাড়া মুমিন হওয়া অসম্ভব। এ কারণেই আমরা দেখেছি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেছেন তাকদিরে অবিশ্বাসকারীরা যত ইবাদত করুক, যত দান করুক তা আল্লাহ কবুল করবেন না যতক্ষণ না তারা তাকদীরে বিশ্বাস করে।
- তাকদীরের অবিশ্বাস করা ফিরকা আছে দুইটিঃ একদল তাকদিরের সব স্তরকেই অস্বীকার করে যাদেরকে কট্টর কদরিয়্যা বলে। আরেকদল হলো মু'তাযিলা কদরিয়্যা যারা তাকদীর বা ভাগ্য সম্পর্কে আল্লাহর ইলম ও লিপিবদ্ধকে স্বীকার করে কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ও সৃষ্টিকে অস্বীকার করে।

(৬) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানঃ মৃত ব্যক্তিদের কবর থেকে আবার জীবিত করা হবে। সব মানুষ আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে। তাদের পোশাক ও জুতা এক জায়গায় একত্র করা হবে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের এরপর মৃত্যুবরণ করতে হবে। অতঃপর নিশ্চয়ই তোমাদের কিয়ামতের দিন আবার উঠানো হবে। (সুরা:মুমিনুন, আয়াত : ১৫-১৬)। এদিন সবাইকে আল্লাহর কাছে দুনিয়ার সমস্ত কাজের হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ কর্মফল অনুযায়ী জান্নাত আর জাহান্নাম নির্ধারণ করবেন।

- আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই হলো মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের বিশ্বাস। এখানে হিসাব আছে, মিজান আছে, আমলনামা আছে, পুলসিরাত আছে, জান্নাত ও জাহান্নাম অন্তর্ভুক্ত আছে। এসব কিছুর স্বপক্ষে কোরআনে যৌক্তিক ও শরঈ দলিল রয়েছে।

তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসঃ

‘কাদার’ (القَدْرُ و القَدَرُ) শব্দ অর্থ পরিমাপ, পরিমাণ, মর্যাদা, শক্তি ইত্যাদি বুঝায়। তাকদীর অর্থ পরিমাপ করা, নির্ধারণ করা, সীমা নির্ণয় করা ইত্যাদি।

উক্ত শব্দটি দুইভাবেই পড়া যায়(القَدْرُ و القَدَرُ) আল ক্বাদারু, আল-ক্বদরু।

তাকদীর দুই প্রকার

☞১. তাকদিরে মুবরাম (অপরিবর্তনীয় ভাগ্যলিপি) অর্থাৎ যেটা কোন সময় পরিবর্তন হয়না। যেমনঃ মৃত্যু যখন তাকদীরে লেখা আছে তখন হবে।

☞২. তাকদিরে মুআল্লাক (ঝুলন্ত ভাগ্যলিপি)। যেমন মানষের জীবনে সুখ শান্তি এবং দুঃখ কষ্ট ইত্যাদি মানুষের কর্মের উপর নির্ভর করে।

তাকদীরে মুবরাম হল, যা কখনোই পরিবর্তন হয় না। অনাদী থেকে আল্লাহর কাছে যা লিপিবদ্ধ আছে তাই সংঘটিত হবে।

আর তাকদীরে মুআল্লাক হল, যা ফেরেশেতাদের খাতায় লিখা থাকে। এই প্রকারের তাকদীর দোয়া বা বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে পরিবর্তন হতে পারে। কুরআন হাদিসে তাকদীর পরিবর্তনের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, তা এই প্রকার তাকদীরের ব্যাপারেই। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে,

‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা করেন স্থির রাখেন, আর তাঁর কাছেই রয়েছে মূল কিতাব।’ [সূরা রা’দ, আয়াত: ৩৯]

হাদিস শরিফে বলা হয়েছে,

‘রাসূল (সা.) বলেছেন, দোয়া ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে না এবং সৎকাজ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই হায়াত বাড়াতে পারে না।’ [সুনানে তিরমিযী, হাদিস: ২১৩৯]

যেমন একটি রাস্তার মোড়ে অবস্থিত একটি উঁচু ভবনের ছাদে দাঁড়ানো কোনো ব্যক্তি যদি মোড়ের দুই দিক থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আগত দু’ টি গাড়ী দেখে , গাড়ী দু’ টির চালকদ্বয় রাস্তার পাশের বাড়ীঘরের কারণে একে অপরের গাড়ীকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু ছাদের লোকটি এসব লক্ষ্য করছে এবং গাড়ী দু’ টির গতিবেগ ও রাস্তার মোড় থেকে উভয়ের দূরত্বের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করে যে , দুই মিনিট পর গাড়ী দু’ টির মধ্যে সংঘর্ষ

ঘটবে , আর সত্যিই যদি দুই মিনিট পর গাড়ী দু' টির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে , তাহলে ঐ সংঘর্ষের জন্য কিছুতেই ভবিষ্যদ্বাণীকারী ব্যক্তিকে দায়ী করা যাবে না। স্মর্তব্য , এ ক্ষেত্রে গাড়ী দু' টির ভিতর ও বাইরের অবস্থা , চালকদ্বয়ের শারীরিক-মানসিক অবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট পথের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে ঐ ব্যক্তির জ্ঞান যত বেশী হবে তার পক্ষে তত বেশী নির্ভুলভাবে ও তত আগে এ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এ দুর্ঘটনার জন্য তাকে দায়ী করা যাবে না।

এমনকি যে সব হস্তক্ষেপ দৃশ্যতঃ নেতিবাচক , যেমন: আযাব নাযিল করণ , সে সবেরও উদ্দেশ্য ইতিবাচক । কারণ , এর মাধ্যমে অন্যদেরকে ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে অনন্ত দুর্ভাগ্যের পথ থেকে অবিনশ্বর সাফল্যের পথের দিকে প্রত্যাবর্তনে উদ্বুদ্ধ করা হয়। শুধু তা-ই নয় , যাদেরকে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয় তাদের জন্যও তা ইতিবাচক। কারণ , পরকালীন জীবনে তথা অনন্ত সৌভাগ্য ও অনন্ত দুর্ভাগ্যের জীবনে ব্যক্তির কর্ম অনুযায়ী তার নে' আমত ও শাস্তির পরিমাণ ও মাত্রায় পার্থক্য হবে। তাই পাপীর ধ্বংস সাধনের ফলে তার পাপের বোঝা আর বেশী ভারী হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় তা তার নিজের জন্যও কমবেশী কল্যাণকর।

এখন প্রথমে আমরা প্রাচীন ও বর্তমানে প্রচলিত কিছু মতবাদ দেখবো যেগুলো মূলত তাকদীরের বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে।

DETERMINISM:

নির্ধারণবাদ হল দার্শনিক বিশ্বাস যা বলে, সমস্ত ঘটনা পূর্ববর্তী বিদ্যমান কারণে সম্পূর্ণ নির্ধারিত হয়। দর্শনের ইতিহাস জুড়ে নির্ধারিত তত্ত্বগুলি বিভিন্ন এবং কখনও কখনও ওভারল্যাপিং উদ্দেশ্য এবং বিবেচনা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। নির্ধারণবাদের বিপরীত হ'ল এক প্রকারের অনন্তবাদ (অন্যথায় ননডেটেরিনিজম বলা হয়) বা এলোমেলোতা । নির্ধারণবাদ প্রায়শই স্বাধীন ইচ্ছার সাথে বিপরীত হয়।

FATALISM:

প্রাণতন্ত্র একটি দার্শনিক মতবাদ যা সমস্ত ঘটনা বা কর্মকে নিয়তির দিকে বশীভূত করার উপর জোর দেয় ।

PREDETERMINISM:

মারাত্মকতা নিম্নলিখিত নীচের যে কোনও ধারণাকে বোঝায়:

আমরা আসলে যা করি তা ব্যতীত অন্য কিছু করতে আমরা শক্তিহীন এই দৃষ্টিভঙ্গি। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে মানুষের ভবিষ্যতে তাদের নিজস্ব ক্রিয়া প্রভাব রাখার ক্ষমতা নেই।

ফ্রিডরিচ নিৎশে তার এই ধারণাটির নাম দিয়েছিলেন "তুর্কি প্রাণঘাতীতা" তার দ্য ওয়ান্ডারার অ্যান্ড হিজ শ্যাডো বইয়ে।

EXISTENTIALISM:

অস্তিত্ববাদ হল বিশ্বাস, সচেতনতা, স্বাধীন ইচ্ছা এবং ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার সংমিশ্রনের মাধ্যমে এমন একটি বিশ্বের মধ্যে নিজস্ব অর্থ তৈরি করা- যার অন্তর্নিহিত নিজস্ব কোনওরকম কাঠামো নেই।

NIHILISM:

নিহিলিজম এমন বিশ্বাস যা বলে যে, মহাবিশ্বের কোনও অন্তর্নিহিত অর্থ নেই। বিকল্প হিসাবে আমাদের নিজস্বতাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা অর্থহীন।

আধুনিক এই সব মতবাদ মূলত প্রাচীন ফিতনাময় ফিরকাদেরই নতুন ভার্সন।

যারা ইন্দ্রিয়গাহ্য বিষয়কে বুঝতে যে যুক্তি ব্যবহার করে যদি সেই একই যুক্তি দিয়ে গায়েব বা অদৃশ্যকে বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে তারাই পথভ্রষ্ট হয়। তাকদীরের ক্ষেত্রেও যারা এই কাজ করেছে তারা গোমরাহ হয়েছে। ইন্দ্রিয় যেমন শক্তিতে সীমাবদ্ধ, আমাদের বুদ্ধিও সীমাবদ্ধ।

সাধারণত মানুষ যা জানে সেসব নিয়েই ভাবে তাই সে মনে করে সে অনেক কিছুই জেনে গেছে। কিন্তু সে কখনও যা জানেনা সেসবের বিশালত্ব কেমন হতে পারে তা ভাবেনা। যদি ভাবতো তাহলে তাঁর জানার পরিধি এক মুহুর্তেই কুঁকড়ে যেত। এ কারণে আমরা যা জানি তা তো জানিই। যা জানিনা সেসব বিষয়ে বলতে হবে আমরা ঈমান আনলাম।

আমরা এখন দেখবো ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কোন কোন বাতিল ফিরকা তাকদীর নিয়ে ভ্রান্তির প্রচার শুরু করেছিলো।

ক্বদরিয়া ফিতনাঃ

আরবি ক্বদর (قدر) শব্দ থেকে ক্বাদরিয়া শব্দটি এসেছে। ক্বদর অর্থ হল ভাগ্য। অথচ ক্বাদরিয়া সম্প্রদায় ক্বদর বা ভাগ্য বিশ্বাস করেনা। তাদের নামের সাথে বিশ্বাসের কোন মিল নেই বরং নামের বিপরীত বিশ্বাসই তারা করে থাকে। তাই বলা হয় যারা ক্বদর বা ভাগ্য বিশ্বাস করেনা তাদের কাদরিয়া বা ক্বাদরিয়া বলা হয়। ক্বাদরিয়া ও মুতাজিলাদের মধ্যে আকিদাগত কিছু মিল থাকার কারনে অনেকে ক্বাদরিয়া ও মুতাজিলাদের একই সম্প্রদায় মনে করেন। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। মুতাজিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলো ওয়াসিল ইবনে আতা অপর পক্ষে কাদরিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলো সীসওয়াহ।

- কদরিয়া সম্প্রদায়ের তাকদীর অস্বীকার প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইলমের অস্বীকারের নামান্তর। কারণ সৃষ্টিকূলের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য প্রধান যে নিয়ামক দরকার তা হলো সৃষ্টিকূলের কি হবে না হবে তাঁর জ্ঞান রাখা। কদরিয়াদের ধারণা কোনোকিছু সৃষ্টি বা উৎপন্ন হওয়ার মুহুর্তেই কেবল আল্লাহ

জানতে পারেন। এর আগে নয়। সুতরাং এটি কেবল বিদাতই নয়, ঈমানের চরম একটি বিপর্যয়ও বটে। যিনি অতীত ভবিষ্যত জানেন কেবল তিনিই তা লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম।

- এদের আবার দুইটা দল আছে। আমরা আগের দারসে দেখেছি। এর একটি হলো কট্টর কদরিয়্যা; যারা তাকদীরের সম্পূর্ণ স্তরকে অস্বীকার করে। আরেকটি দল হলো যারা মু'তাযিলা কদরিয়্যা বা লিবারেল কদরিয়্যা; যারা তাকদীরের প্রথম কিছু স্তরকে অস্বীকার করে। পরের কিছু স্তরকে স্বীকার করে। তাকদীরের এই স্তরগুলো একটু পরেই আমরা জানবো।

জাবরিয়া ফিতনাঃ

কাদরিয়া সম্প্রদায় কদর বা ভাগ্য বিশ্বাস করেনা। আর জাবরিয়াদের আকিদা কাদরিয়াদের আকিদার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের মতে বান্দার ইচ্ছাধীন কোনো কাজ করতে পারেনা, বরং আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদের কর্মসমূহ পূর্বেই নির্ধারন করে রেখে দিয়েছেন। মানুষর ইচ্ছার কোন দখন নেই। সকল জিনিসই আল্লাহর হুকুমের কাছে অনুগত কাজেই কোন জিনিসই আল্লাহর ইচ্ছায় পরিবর্তন করতে পারে না। মহান আল্লাহ যেহেতু ভবিষ্যৎ জানেন কাজেই ভবিষ্যতের সকল কাজ কর্ম আল্লাহন ইচ্ছা অনুযাই সাজান আছে। তাদের বিশ্বাস, মানুষের ভাল বা মন্দ করার কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহই তাকে ভাল বানান এবং আল্লাহই তাকে মন্দ বানান। এতে তার ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। তাদের এই আকিদা কুরআন বিরোধী।

যারা তাকদীরকে অস্বীকার করে তাঁরা মূলত আল্লাহর ইলম, ইচ্ছা, লিপিবদ্ধ করার শক্তি ও সৃষ্টির শক্তিকে অস্বিকার করে। এ কারনে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যারা তাকদীরকে অস্বিকার করে তাঁদেরকে আল্লাহর ইলম সম্পর্কে প্রশ্ন কর, সেখানেই তাঁরা আটকে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কদরিয়্যাহ হলো এই উম্মতের অগ্নিউপাসক। অর্থাৎ, অগ্নিউপাসকরা বিশ্বাস করে ভালর জন্য এক উপাস্য, মন্দের জন্য আরেক উপাস্য আছে। একইভাবে কদরিয়্যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করে ছেড়ে দিয়েছেন, এখন আমরা আমাদের নিজেদের কাজ নিজেরা সৃষ্টি করছি। অর্থাৎ দুই স্রষ্টার প্রবক্তা।

আর যারা বলে আমাদের উপর তাকদ্বীর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তাই আমরা যা করি এর জন্য আমরা দায়ী নই, এ কথা ইবলিস সর্বপ্রথম বলেছিল। সে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে আদমকে সেজদা করেনি। পরে বলেছিলো এটা তো আপনি আগে থেকেই লিখে রেখেছেন।

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো এই দুই ভ্রান্ত ফিরকার মাঝে মধ্যপন্থী। আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ সবকিছুর সারমর্ম যেমন লিখে রেলহেছেন, বিস্তারিতও লিখে রেখেছেন। কিন্তু যা লিখেছেন সবই আমাদের কল্যাণের জন্য। আমরা যতক্ষণ না এসব জানছি ততক্ষণ এসব আমাদের কাছে

গায়েব। গায়েবী বিষয় জানা থাকা না থাকা সমান, লিখিত থাকা না থাকা সমান। আমাদেরকে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা করতে হবে। এই পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা তাকদীরের অংশ।

এই যে, গোড়ায় গন্ডগোল লাগানো ফিরকাগুলো তাদের নিজেদের ঝামেলা থেকে নিজেরাই বের হয়ে আসতে পারেনা। জাবারিয়্যা বলে মানুষ যা করে এর জন্য তাঁরা বাধ্য। তাহলে প্রশ্ন আসবে, এই যে দেবদেবীর পূজা এগুলোর জন্যে দায়ী কে? মূর্তি নির্মাণের জন্য দায়ী কে? আল্লাহ নিজেই নিজের শরীক বানাতে দিচ্ছেন আবার নিজেই তা হারাম করছেন? তোমরাই তো আল্লাহর পবিত্রতা রক্ষার্থে তাঁকে মানুষের সব কাজের ক্ষমতা দিয়ে দিচ্ছ। এখন কিভাবে তাঁকে পবিত্র করবে? একইভাবে তাঁদেরকে জাহান্নামের নতুন সংজ্ঞা আনতে হবে, বিচারের নতুন সংজ্ঞা আনতে হবে।

উবাদা বিন সামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একদা তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেনঃ

«يَا بُنَىَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ. قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ». يَا بُنَىَّ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّى»

‘‘হে বৎস, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি এ কথা বিশ্বাস করবে যে, তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা ঘটারই ছিল। আর যা ঘটেনি তা কোনো দিন ঘটার ছিলনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি এ কথা বলতে শুনেছি, সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা যা সৃষ্টি করলেন তা হচ্ছে কলম। সৃষ্টির পরই তিনি কলমকে বললেন, লিখো। কলম বললঃ হে আমার রব, আমি কী লিখবো? তিনি বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত সব জিনিষের তাকদীর লিপিবদ্ধ করো। হে বৎস! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তাকদীরের উপর বিশ্বাস করা ব্যতীত মৃত্যু বরণ করলো, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়’’।(আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ তাকদীর সম্পর্কে। হাদীছ নং- ৪৭০২)

তাকদীরের স্তর বা পর্যায়ঃ

ইমাম আবু হানীফাহ রহ.-এর ফিকহে আকবার গ্রন্থের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাকদীর ৫ প্রকার। যথা- (১) আল্লাহপাক সকল কিছুর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। (২) লাওহে মাহফুজে তা অঙ্কিত করেছেন। (৩) সৃষ্টিজগতে তা প্রকাশ করেন। (৪) আখেরাতের জগতের জন্য পরিপূর্ণ প্রতিফল প্রদান নির্ধারণ করেন ও (৫) বিনিময় দান করেন। (শরহু ফিকহে আকবর, পৃ ৫৩; আল আকীদাতুল ওয়াদিতিয়্যাহ ময়াস শরহে, পৃ. ২৭৮-২৭৯)। হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. উল্লিখিত তাকদীরের ৫টি প্রকারকে এভাবে বিন্যাস করেছেন।
যথা-

(১) ইলমঃ আল্লাহপাক **আজালী ইলমে** এটা স্থিরিকৃত যে, বিশ্বজগতকে বান্দাহর কল্যাণকর ও উপযোগী বিবেচনা করে সুন্দরতমরূপে সৃষ্টি করা হবে।
(২) লিপিবদ্ধঃ আল্লাহপাক তাকদীর নির্ধারণ করেছেন। অন্য কথায় তিনি সকল সৃষ্টির **তাকদীর লিখে** রেখেছেন আসমান ও জমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে। এই উভয় রাজ্যের মূল অর্থ এক ও অভিন্ন।
(৩) আকৃতিঃ আল্লাহপাক যখন হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করেছেন, তখন নির্ধারণ করেছেন যে, তিনি সর্বপ্রথম মানুষ তথা আদি মানব হবেন। তার থেকে মানব জাতির সূচনা হবে। তিনি **মিছালী জগতে** আদম সন্তানের **আকৃতিসমূহ উদ্ভাবন** করেছেন। তাদের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যকে আলো ও আঁধারের সাথে উপমা দিয়েছেন। তাদেরকে মুবাল্লাক বা শরয়ী বিধানের প্রয়োগস্থল নির্ধারণ করেছেন। তাদের মাঝে আল্লাহর মারিফাত ও তার সামনে বিনত হওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন।
(৪) ইচ্ছাঃ ওই সময়ের তাকদীর যখন মাতৃউদরে সন্তানের **দেহে আত্মা** ফুঁকে দিয়েছেন এবং
(৫) সৃষ্টিঃ কোনো ঘটনা বাস্তবায়িত হবার **পূর্বক্ষণে** নির্ধারিত তাকদীর। যখন উর্ধ্বজগত হতে নির্দেশ পৃথিবীতে আসে। তা একটি মিছালী বস্তুতে পরিবর্তিত হয়। অতঃপর তার বিধান পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ: খন্ড ১, পৃ. ১৫৩)।

ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, মানুষের আয়ূ দুই ধরনের: এক ধরনের আয়ূ অনড়, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। দ্বিতীয় প্রকারের আয়ূ কোন শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। এর আলোকে রাসূল সা.-এর নিম্নোক্ত হাদীসটির অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠে,

মহান আল্লাহ ফেরেশতাকে বান্দার আয়ূ লেখার নির্দেশ দেন এবং তাঁকে বলে দেন, বান্দা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে তুমি তার বয়স এত বছর বাড়িয়ে দিও। কিন্তু তার বয়স বাড়বে কি বাড়বে না সে বিষয়ে ফেরেশতা কিছুই জানেন না। কেবল আল্লাহই তার সুনির্দিষ্ট বয়স সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন। তারপর তার মৃত্যু এসে গেলে আর সময় দেওয়া হয় না। ফাতাওয়া ইবনে তায়মিইয়াহ, ৮/৫১৭।

ইবনুল কায়্যিম বলেন: আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা রহমত স্বরূপ। যদিও তা প্রদান বন্ধ করে হতে পারে; পরীক্ষা হলেও সেটি কল্যাণকর। আর তাঁর নির্ধারিত দূর্যোগও মঙ্গলজনক। যদিও তা পীড়াদায়ক হয়। (মাদারিজ আল-সালেকীন, ৪/২১৫)

ভিন্নপ্রকারঃ

সময় ও পাত্র হিসেবে ভাগ্যের আবার **চারটি স্তর** রয়েছে। **এক.** গোটা সৃষ্টির ভাগ্যলিপি। **দুই.** মানুষের সাধারণ ভাগ্যলিপি। **তিন.** বার্ষিক ভাগ্যলিপি। **চার.** দৈনন্দিন ভাগ্যলিপি।

এক. সাধারণ ভাগ্যলিপি হচ্ছে গোটা সৃষ্টিজগতের ভাগ্য। পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণুর বিকাশ ও পরিণতি লাওহে মাহফুজে লেখা আছে। এটি আসমান ও জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগে আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুজ বা সংরক্ষিত ফলকে লিখে রেখেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘সৃষ্টিজগতের ভাগ্য আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগে লেখা হয়েছে।’ (মুসলিম শরিফ, হাদিস : ২৬৫৩)

দুই. দ্বিতীয় স্তরের ভাগ্য মানুষের ভাগ্যলিপি। মহান আল্লাহ মায়ের গর্ভে মানুষের আকৃতি সৃষ্টি করে তার ভেতর রুহ দান করেন। তখন তার ভাগ্যলিপিতে কিছু বিষয় লিখে দেওয়া হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক মানুষ তার মায়ের পেটে ৪০ দিন বীর্যরূপে জমা থাকে। তারপর পরিবর্তিত হয়ে রক্তপিণ্ডের আকার হয়। এরপর পরিবর্তিত হয়ে মাংসপিণ্ড হয়। অতঃপর আল্লাহ তার কাছে ফেরেশতা পাঠিয়ে রুহ ফুঁকে দেন। আর তার প্রতি চারটি নির্দেশ দেওয়া হয়। লিখে দেওয়া হয় তার আয়ু, তার জীবিকা, তার আমল ও সে দুর্ভাগা, না সৌভাগ্যবান। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৩৩২)

তিন. ভাগ্যের তৃতীয় স্তর হলো বার্ষিক ভাগ্য। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ ওই বছরের পরিকল্পনা ফেরেশতাদের কাছে অর্পণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি একে (কোরআন) নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয়।' (সুরা : দুখান, আয়াত : ২-৪)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠতম তাফসিরবিদ হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটি পবিত্র কোরআন অবতরণের রাত। ওই রাতে সৃষ্টি সম্পর্কিত সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়। লাওহে মাহফুজে রক্ষিত মূল গ্রন্থ থেকে আগামী এক বছরের ঘটিতব্য বিষয় এ রাতে পৃথক করা হয়। আল্লাহর নির্ধারিত সব ফয়সালা এ রাতে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের কাছে অর্পণ করা হয়। (তাফসিরে কুরতুবি)।

চার. ভাগ্যের চতুর্থ স্তর হলো দৈনিক ভাগ্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী। তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ 'শানে' (কাজে) নিয়োজিত।' (সুরা : আর-রহমান, আয়াত : ২৯)। আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখায় লিখেছেন, আল্লাহর 'শান' হলো, যে তাঁকে ডাকে, তিনি তার ডাকে সাড়া দেন। যে তাঁর কাছে চায়, তিনি তাকে দান করেন। তিনি অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করেন। গুনাহগার ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করেন। তাঁর কাজ হলো, গোটা আসমান ও জমিনবাসীর প্রতিদিনের প্রয়োজন পূরণ করা।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ যখন বাকি থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশে নেমে আসেন। তিনি জগদ্বাসীকে ডাকতে থাকেন—কে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আমার কাছে (কোনো কিছু) চাইবে, আমি তাকে দান করব? কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।' (বুখারি শরিফ, হাদিস : ১১৪৫)

ঈমানী পরীক্ষাঃ

শুধু মৌখিকভাবে ঈমান আনলেই কোনো ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার দাবিদার নয়। প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার জন্য তাকে জান-মাল ও নানা বিপদ-আপদে ইমানী পরিক্ষায়ও উত্তীর্ণ হতে হবে। এ প্রসঙ্গে কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন, 'তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা কোনো পরীক্ষা দেয়া ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যেমনটি তোমাদের পূর্বের লোকদের পরীক্ষা করা হয়েছিল? তারা কঠোর দারিদ্রতা ও মুশকিল

দ্বারা ব্যথিত হয়েছিল এবং এমনভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল যে, এমনকি রাসূল ও তার সঙ্গে থাকা ঈমানদারগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে। হ্যা। নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।' (সূরা বাকারা, আয়াত ২১৪)

> তাকদীরের মাসায়েলে ইমাম আবু হানিফা বলেছেনঃ এটি মধ্য দুপুরে সূর্যের দিকে তাকানোর মত ব্যাপার। অর্থাৎ, সূর্যের দিকে ঐ সময় তাকালে যেমন দৃষ্টি হারাতে হবে, তাকিয়েও কিছু দেখতে পারা যাবেনা। একইভাবে তাকদীর বুঝতে গেলে আমাদের আকল আবশ হয়ে যাবে কিংবা গোমরাহ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন, 'এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।' (সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৫) তিনি আরও বলেন, 'অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরেকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং পরহেজগারী অবলম্বন কর, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার। (সূরা আলে ইমরান, ই

আয়াত ১৮৬)

তাকদীর পরিবর্তনঃ

পৃথিবীর চলমান প্রতিটি বিষয় তাকদীর। নিয়মমাফিক সবকিছু চলাটা যেমন আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরকে প্রমান করে, হঠাত এসব প্রাকৃতিক বিষয়ে ছন্দপতন ঘটাও আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরকে প্রমাণ করে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকা যেমন তাকদীর, হঠাত করে বিপদ নেমে আসা, দুর্যোগ ও ভূমিকম্প চলে আসাও আল্লাহর তাকদীরের হিসেব। তিনি চাইলে সবকিছু স্বাভাবিক চালাতে পারেন, চাইলে গলযোগপূর্ণ করে রাখতে পারেন।

২. তাকদীর পরিবর্তন করতে পারে এমন কিছু আমল আছে। এর একটা হলো দুআ, আরেকটি হলো মাতাপিতার সেবা, আরেকটি হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা।

৩. এর মাধ্যমে যে তাকদীর পরিবর্তন হয় সেটাও তাকদীরের অংশ। যেমন আল্লাহ ঠিক করে রেখেছেন কেউ অসুস্থ হলো, এরপর যদি সে আল্লাহর কাছে দোয়া করে তাহলে সে সুস্থ হবে। অন্যথায় তা আল্লাহর নির্ধারিত পথে চলতে থাকবে।

সারমর্মঃ

পৃথিবীর নিয়মকানুন হলো আলাহর সৃষ্ট তাকদীর। আপনি সেই নিয়মের উপর বিশ্বাস আনুন আর না আনুন, নিয়ম নিয়মের মত করেই চলবে। সাঁতার না জেনে পানিতে ঝাঁপ দিলে আপনি মরবেন, বিমান থেকে ঝাপ দিলে মরবেন, না পড়ে পরীক্ষা দিলে অকৃতকার্য হবেন। আর যদি বিশ্বাস রাখেন তাকদীরে, তাহলে এই বিশ্বাসটাই আপনার মধ্যে প্রস্তুতি নেয়ার স্পৃহা তৈরি করবে। উপকরণ ব্যবহার করার সংকল্প

তৈরি করবে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থেকেই তাকদীরের এই অংকটি নির্ধারিত হয়। বলা হয়- প্রচেষ্টা করা তাকদীরেরই অংশ।

তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস কখনও দায়মুক্তি দেয়না। বরং ফলাফলকে সুধারণার সাথে গ্রহণ করার শিক্ষা দেয়। সূরা নূরের ১১ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন- যারা অপবাদ রটায় তাদের এই কাজটির কারণে ক্ষতি হয়েছে মনে করোনা, বরং এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কিন্তু আল্লাহ এও বললেন যে- যারা এই রটনায় ভূমিকা পালন করেছে তাঁদেরকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। তাহলে দেখুন ফলাফলটা ভালো হলেও ঘটনার জন্য দায়ীরা দায়মুক্তি পাবেনা।

তাকদীরের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের কাজ নির্ধারণ করেন। এমন সব কাজ যা করার এখতিয়ার মানুষের আছে, আবার যেসব কাজের এখতিয়ার মানুষের নাই। সৃষ্টিজগত তাকদীরের সামনে দুই প্রকার। এক, হলো নিয়ন্ত্রিত। যেমন চন্দ্র, বাতাস, সূর্য, গাছ, পাহাড় ইত্যাদি। দুই, যাদের এখতিয়ার আছে। যেমন মানুষজ্বীন ইত্যাদি। এরা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে নিজেদের এখতিয়ার ফেরেশতা ,পশু , অনুযায়ী আমল করে। কিন্তু পশুদের জন্য আল্লাহ ফিতরাত বা স্বভাব ঠিক করেছেন শরিয়ত নির্ধারণ করেননি। মানুষের জন্য ফিতরাত ও শরিয়ত ঠিক করেছেন। যার মাধ্যমে তাঁরা সত্যকে চিনে নিতে পারবে। ফেরেশতাদের জন্য আল্লাহ ফিতরাত ঠিক করেছেন, শরিয়ত ঠিক করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কিছুই দেননি যার প্রভাবে আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করতে পারে। আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করতে পারে এমন প্রভাবক তিনটি। এক, নফসে আম্মারা। দুই, শয়তান (জ্বীন থেকে)। তিন, শয়তান তাঁরা জড়বস্তুর মত না। আবার মানুষের মত খারাপ ,ফেরেশতাদের এখতিয়ার আছে ।(মানুশ থেকে) দ্বারা প্রভাবিত হয়না।

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, মূলত তাকদীর হলো আমাদের জীবনে কি ঘটবে, কি ঘটতে পারে, কি ঘটবে না এর সমূহ হিসাব। যেমন- একজন ব্যক্তি সকালে বের হলে সেদিন কি বা কতটুক উপার্জন করবে তা নির্ধারিত করা আছে, যদি দুপুরে বের হয় তাহলে কেমন উপার্জন হবে সেটাও লিপিবদ্ধ আছে। সন্ধ্যায় বের হলে কতটুকু উপার্জন হবে এটাও ঠিক করা আছে। এখন ঐ ব্যক্তির ইচ্ছার উপরেই তাঁর রিযিক নির্ভর করছে। এভাবে আমাদের জীবনের প্রতিটি বিষয় ছকবাধা। কিন্তু আমরা জানিনা কি লিখা আছে। তাই আমাদের একমাত্র কাজ হলো চেষ্টা করে যাওয়া।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। এবার আমাকে বলুন- ইহসান কি? রাসুলুল্লাহ বললেন- এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদিও তুমি তাঁকে দেখতে পাওনা, কিন্তু এটা জেনে রাখা যে তিনি ঠিকই তোমাকে দেখছেন।

ইমাম নববী উল্লেখ করেন, আল্লাহ আপনাকে দেখছেন, আপনিও যদি তাঁকে দেখতে পান তখন ঠিক যেমন আদব রক্ষা করে ইবাদত আদায় করবেন সেটা মনে উপস্থিত রাখা হলো ইহসান। মূলত তিনি আপনাকে দেখছেন বলেই এই আদব রক্ষা করা। আপনি দেখবেন বলে নয়, বস্তুত তিনি তো আপনাকে সর্বদা দেখছেন। সুতরাং ইবাদতের সময়ে আপনি তাঁকে দেখতে না পেলেও সুন্দরতম ইবাদত আদায় করেন। আর হাদিসের

বাতলে দেয়া এই মূলনীতিটাই দ্বীনের মৌলিক স্তম্ভ। মুসলিম সমাজের বুনিয়াদ, সিদ্দিকীনদের প্রধান সূত্র, সুপথের পথিকদের মূল লক্ষ্য, আরেফীনদের খনি এবং সালেহীনদের চরিত্র।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا ». رواه مسلم

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন- আল্লাহ প্রতিটি জিনিসেই ইহসান লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই যখন তোমরা কিছু জবাই করবে তখন তাতে পরিশুদ্ধতা অবলম্বন করবে।

إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه

তিনি আরো বলেছেন- যখন কোন বান্দা কিছু করে এবং তা নিখুঁতভাবে করে তা আল্লাহ ভালোবাসেন।

ইহসান হলো ইসলাম ও ঈমানের চেয়েও উচু স্তরের ইয়াকীন। অর্থাৎ, একজন মানূষ প্রথমে মুসলিম হয়, এরপর আমল করতে করতে ঈমান মজবুত করে মুমিন হয়, এরপর ঈমান ও ইয়াকীনের চর্চা করতে করতে মুহসিন হয়।

ইহসানের শাব্দিক অর্থ দুইটি। একটি হলো অন্যের উপকার করা। আরেকটি হলো ইতকান। মানে হলো বিশুদ্ধতা বা নিখুঁতভাবে কাজ করা। সূরা নাহালের ১২৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন- আল্লাহ নিশ্চয় তাদের সাথে আছেন যারা মুত্তাকি ও মুহসিন, অর্থাৎ যারা তাঁকে পরহেজ করে এবং বিশুদ্ধরূপে তাঁর ইবাদত করে।

হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারছি, ইহসানের দুইটি স্তর আছে। এক, আল্লাহ তো দেখছেনই, আমিও আল্লাহকে দেখছি। এটি সর্বোচ্চ স্তর। এই স্তরে পৌঁছাতে প্রচুর মেহনতের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় স্তর হলো, আমি দেখতে পাইনা, কিন্তু অন্তরে একথা উপস্থিত রাখা যে, তিনি আমাকে দেখছেন।

প্রথম স্তরকে বলা হয় মুশাহাদাহ, দ্বিতীয় স্তরকে বলা হয় মুরাকাবাহ।

একই রকম আরেকটি বিষয় হলো আল্লাহর অলী হওয়া। বা আল্লাহ আপনার অলী হওয়া। অলী অর্থ নিকটবর্তী হওয়া, বন্ধু হওয়া। প্রথম স্তর হলো- আল্লাহ আপনার বন্ধু হয়ে যাওয়া। যেমন আল্লাহ বলছেন- আল্লাহ মুত্তাকীদের অলী। আরেক জায়গায় বলছেন আল্লাহ মুমিনদের অলী।

দ্বিতীয় স্তর হলো, আপনিই আল্লাহর অলী হয়ে যাওয়া। যেমন আল্লাহ বলছেন, আল্লাহর বন্ধু বা অলী হলো যারা ঈমান আনে আর মুত্তাকী হয়।

পার্থক্য কি? পার্থক্য হলো নৈকট্যে। আল্লাহ যদি আপনার অলী হয়ে যান তাহলে তিনিই সর্বদা আপনার সুখে দুখে থাকবেন। আর আপনি আল্লাহর অলী হলে মানব স্বভাবের দুর্বলতা বশত আপনি সবসময় তাঁর স্মরণ করতে না পারলেও অধিকাংশ সময় তাঁকে স্মরণে রাখবেন। যেমনটা আমরা ইহসানের ক্ষেত্রেও দেখলাম। উভয় পক্ষ থেকে দেখার বিষয় হলে তা ইহসানের চূড়া, আর কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখার বিষয় থাকলে তা ইহসানের দ্বিতীয় স্তর।

এ হলো ইবাদতের মধ্যে থাকা ইহসানের পরিচয়। যা আল্লাহর সাথে চর্চা করা হয়। ইহসানের আরেক প্রকার হচ্ছে- বান্দার সাথে ইহসান করা।

বান্দার সাথে আমাদের আচরণ ও ব্যবহারের তিনটি স্তর আছে। নেতিবাচক স্তরটি হলো জুলুম। যেখানে অধিকার হরন করা হয়ে থাকে। এরপরের স্তর হলো ইনসাফ। যেখানে বরাবর অধিকার আদায় করা হয়ে থাকে। আর সর্বোচ্চ স্তর হল ইহসান। এর মানে হলো প্রাপ্যের চেয়েও বেশি প্রদান করা। এ কারণে আল্লাহ কোরআনে যত জায়গায় মা বাবার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিটি জায়গায় “ইহসান” শব্দ দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ, মা বাবা আমাদের জন্য যা করেছেন তাঁর সমান সমান বদলা দেয়া তো অসম্ভব, এরপরেও তিনি আমাদেরকে বলেছেন উনাদের প্রাপ্যের চেয়েও বেশি দেয়ার চেষ্টায় থাকার জন্যে। এর ফলে তাদের যত্নে ত্রুটি হওয়ার পথ বন্ধ হবে।

তাই ইহসান হলো, আপনার পরিবার, সন্তান, স্ত্রী, স্বামী, প্রতিবেশি, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি প্রত্যেকের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করার নাম। এমনকি পশুপাখির সাথেও ইহসান করা কথা এসেছে। যেমনটা আমরা হাদিসে দেখলাম। এছাড়া আরেক হাদিসে এসেছে- প্রতিটি জীবন্ত হৃৎপিণ্ডের সেবার জন্য প্রতিদান আছে।

ইহসানের সাথে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার সূত্র গাঁথা আছে। কারণ তিনি বলছেন- আল্লাহ মুহসিনদের ভালোবাসেন। আপনার ইহসান যে পরিমাণের হবে, আল্লাহর ভালোবাসা আপনার প্রতি সেই পরিমাণে হবে।

একইভাবে আল্লাহর দয়া ও রহমতের গ্যারান্টি আছে ইহসানের সাথে। আল্লাহ বলছেন- আল্লাহর রহমত মুহসিনদের নিকটবর্তী।

এ কারণে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- কেউ যখন তোমাদের কোন উপরকার করে তুমিও এর বিনিময় দেয়ার চেষ্টা কর, যদি যথেষ্ট বিনিময় দিতে না পার তাহলে তাঁর পূর্ণ বিনিময় হওয়ার মত দোয়া করে দাও।

এখন আমাকে বলুন, কেয়ামত সম্বন্ধে (তা কবে হবে)'। রাসূলুল্লাহ উত্তর বললেন, 'এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চেয়ে প্রশ্নকৃত বেশি জানেনা'। (অর্থাৎ, আমি আপনি অপেক্ষা অধিক কিছু জানি না) (এবং কেয়ামত) সেই পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্গত যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নয়। অত:পর হুজুর (সা:) প্রমাণ স্বরূপ কোরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন। অর্থাৎ, 'আল্লাহর নিকট রয়েছে কেয়ামতের এলম তা কবে হবে, কিরূপে হবে। তিনি বৃষ্টি নাযেল করে থাকেন'।

- প্রশ্ন সবসময় জানার জন্যে করা হয় তা কিন্তু না, কখনও প্রশ্ন করা হয় আরো বেশি জানার জন্যে, যা জানা আছে তাঁর নিশ্চয়তার জন্য, অধিক দলিল জানার জন্য।

ইবনে মাসউদ (রা) বলেনঃ তোমাদের নবীকে সবকিছুর জ্ঞান দেয়া হয়েছে একমাত্র এই পাচটি বিষয় ছাড়া। ইবনে উমর (রা) রাসুলুল্লাহ (স) থেকে বর্ননা করেনঃ আমাকে পাচটি বিষয় ছাড়া বাকী সবকিছুর চাবিকাঠি দেয়া হয়েছে। ঐ পাচটি হলোঃ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জরায়ূতে যা আছে, তা তিনি জানেন। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে সে মারা যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

জানা-না জানার ভিত্তিতে গায়েব তিন প্রকারঃ

একটি হলো- এমন গায়েব যা আল্লাহ সাধারণ মানুষকে জানার সুযোগ করে দেন। আরেকটি হলো এমন গায়েব যা তিনি বিশেষ বিশেষ রাসূলদেরকে জানান। আরেকটি হলো যা কেবল তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না।

১. আমাদের চোখের সামনে যা কিছু আছে এর প্রতিটি বিষয়ের পিছনে আছে গায়েবি জগত। এসব গায়েব চেষ্টা গবেষণা করলে কিছু কিছু জানা যায়। এগুলোকে আমরা বিজ্ঞান বা গবেষণা বলি। সূরা আনআমের ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ এ বিষয়টি বলেছেন। এসব গায়েব কখনও দেখা দেয়, কখনও গায়েব রয়ে যায়। কারো কাছে ধরা দেয়, কারো কাছে গায়েবই রয়ে যায়।
২. সুতরাং এ ধরণের গায়েব দুই প্রকার- এক, এমন গায়েব যা আপনার কাছে গায়েব কিন্তু অন্য কারো কাছে তা দৃশ্যমান। দুই, এমন গায়েব যা গায়েব ছিলো পরে দৃশ্যমান হয়েছে। এ ধরণের গায়েবগুলো দুই পদ্ধতিতে দৃশ্যমান হতে পারে- এক, মানব গবেষণার ফলাফল স্বরূপ। দুই, হঠাৎ করে আকস্মিকভাবে কোন ঘটনার মাধ্যমে। এবং বলাই বাহুল্য, পৃথিবীর অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই আকস্মিক ঘটনার মাধ্যমেই আবিষ্কৃত হয়েছে। মানব গবেষণায় যা দৃশ্যমান হয় সেগুলোও আল্লাহর স্থাপিত উপাদানের চিহ্নরেখা অনুসরণ করেই হয়ে থাকে। যেভাবে আমরা অংক মিলাই, ব্যাপারটা অনেকটা তেমনই।

৩. তাহলে এই গায়েব হলো এমন গায়েব যা আল্লাহ সৃষ্টিকূল থেকে অদৃশ্য রাখেন, এরপর কোন উপাদান বা ঘটনার প্রেক্ষিতে তা উন্মোচন করেন। এটা একেবারেই সাধারণ গায়েব। যা মুসলিম অমুসলিম যে কারো জন্যেই আল্লাহ খুলে দিতে পারেন। বিষয়টি আমরা বুঝতে পারি আয়াতুল কুরসি থেকে।

আরেক ধরণের গায়েব আছে। যা আল্লাহ কারো কাছেই প্রকাশ করেন না, কেবল এমন কিছু নির্বাচিত রসুলদের কাছে এর কিছুটা প্রকাশ করেন যাদের উপর তিনি পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট। বুঝা গেলো, কিছু রসূলকেই কেবল আল্লাহ মাঝেমধ্যে গায়েবের সংবাদ জানিয়ে থাকেন, এবং এটা তাদের জন্য মুজিযা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার। মনে রাখতে হবে, উপহার আমরা কেবল ততটুকুই পাই যতটুকু দাতা আমাদেরকে দেন। এর বেশি কিছুতে আমাদের আয়ত্ত্ব থাকেনা। মনে করুন একজন দোকানদার খুশি হয়ে আপনাকে বললো- এই দোকান থেকে যা ইচ্ছা খান। এর মানে এই না যে তিনি আপনাকে দোকানের মালিকানা দিয়ে দিয়েছেন, চাবি দিয়ে দিয়েছেন। গায়েবটাও এমনই। এ কারণে আল্লাহ বলছেন- গায়েবের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর হাতে।

এ কারণে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- আমি এমন কিছু দেখি যা তোমরা দেখনা, এমন কিছু শুনতে পাই যা তোমরা শুননা। এর অর্থ হলো আল্লাহ যা কিছু তাঁকে দেখিয়েছেন, ঠিক যতটুকু শুনিয়েছেন তিনি ততটুকুই জেনেছেন, শুনেছেন, এবং দেখেছেন।

শেষ প্রকার হলো ঐ পাঁচটি প্রধান গায়েবী বিষয় আল্লাহ সম্পূর্ণ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। এর বাহিরেও কিছু গায়েব আছে যা কেউ জানেনা। যেমন রূহের প্রকৃতি। রিযকের রহস্য। তাকদ্বীরের গোলকধাঁধা। ইত্যাদি। এর প্রকৃতি কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া। আমরা কেবল ধারণা ও গবেষণা করে কিছু বলতে পারি।

পরিধি বা সীমাবদ্ধতার দিক দিয়ে ইলমুল গায়ব দুই প্রকার। এক, মুতলক- অর্থাৎ সর্ববিরাজিত ইলম। যে ইলম মহাজগতের তাবৎ বিষয়কে আয়ত্ত করে। এ ইলম কেবল আল্লাহর আয়ত্তে। দুই, নির্দিষ্ট ইলম। যেমন আগামী দশ বছরের সূর্যের গতিপথ, সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি এসব সাধারণ মানুষের কাছে গায়েবী হলেও বিশেষজ্ঞদের কাছে পূর্বাভাস। যদিও এসব গবেষণার উপর নির্ভর করে। একইভাবে অন্তর্দৃষ্টি, স্বপ্নের ব্যাখ্যাও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ এসব যাকে জানান কেবল সেই জানে। স্বপ্নের ক্ষেত্রেও যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সহ স্বপ্ন হয় যেমন অমুক তারিখের অমুক জায়গায় অমুক ঘটনা ঘটবে- তাহলে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। কিন্তু সাধারণ অনির্দিষ্ট স্বপ্ন হলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা হতে পারে। কিন্তু এর ব্যাখ্যার উপরেও অনেক কিছু নির্ভর করে। তাই যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করবে সেও যদি গায়েবী বিষয়ে অনুপ্রবেশ করে তাও বাতিল বলে গণ্য হবে।

মায়ের গর্ভে সন্তান প্রথমে রক্ত থাকে, এরপর মাংসপিন্ড হয়, এ সময় কি কারো পক্ষে সম্ভব এ সন্তান সম্পর্কে জানানো? যখন আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে রুহ ফুকে দেন এবং ফেরেশতাদেরকেও জানিয়ে দেন এই সন্তানের ভবিষ্যত কেবল তখনই কিছু কিছু জিনিস আমরাও জানতে পারি। এটি আল্লাহ ঐ সন্তানকে গায়েব থেকে প্রকাশ্যের দিকে আসার অনুমতি দিয়েছেন বলেই সম্ভব হচ্ছে। এর প্রমাণ হলো, ওই সন্তানের ভাগ্য লেখার জন্য ফেরেশতা পাঠানো। সেই ফেরেশতাও এর আগ পর্যন্ত এসব জানতে পারেনা।

গনকঃ

একদল গণক দাবি করে তারা গায়েব জানে, আমরাও ওদের কান্ড দেখে বিশ্বাস করি। যেমন ধরুন- আমার মায়ের নাম, আমার কাছে গায়েব না। কিন্তু আপনার কাছে বা আএকজন অপরিচিত গনকের কাছে গায়েবের বিষয়। একইভাবে আমার মোবাইল নাম্বার বা আজ সকালে আমি কি খেয়েছি সেটা আপনার কাছে গায়েব হলেও আমার কাছে নয়। এখন আপনি যখন গনকের কাছে যাবেন যে তার জ্বীনকে আপনার সাথে থাকা জ্বীনের কাছে পাঠাবে। আপনার জ্বীনকে জিজ্ঞেস করবে আপনার মায়ের নাম কি, আপনি আজ সকালে কি খেয়েছেন? গত কয়েকদিনের মধ্যে বড় কোন ঘটনা ঘটে থাকলে তাও বলবে। আপনি এসব গনকের মুখে শুনে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে থাকবেন সে বুঝি গায়েব জানে। অথচ এসব খবর আপনার ঘরের লোকেও জানে। কেবল অদৃশ্য পন্থায় সে এটা জেনেছে বলে আমাদের কাছে গায়েব জানছে বলে মনে হয়।

এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিলো নবীজির সাথেও। ইবনে সয়্যাদ নামে এক বালকের মধ্যে সাহাবীরা দাজ্জালের বেশ কিছু সাদৃশ্য দেখতে পেল। সে অনেক কিছু বলে দিতে পারে। সে ইহুদি ছিলো। নবীজি তাকে পরীক্ষা করার জন্যে বললেন- আচ্ছা, আমি আমার কল্পনায় একটি জিনিস ভাবছি। বল দেখি সেটা কি? ইবনে সয়্যাদ অনেক্ষণ চেষ্টা করলো। মূলত নবীজি (স) একটি আয়াত ভাবছিলেন যেটা কেয়ামতের দিন আকাশ থেকে ধোঁয়াটে আগুন ঝরে পড়ার কথা বলছে। ইবনে সয়্যাদ তার জ্বীনকে কাজে লাগাতে চেয়েও পারলো না। কারণ রাসূলের উপর এসব কারসাজি সফল হয়না। ফলে সে অনেক চেষ্টাও করে কেবল ধো ধো এই অক্ষরদুটি বলতে পারলো। নবীজি বুঝলেন এই ছেলে জ্বিন ব্যবহার করে এসব করে। তিনি বললেন- সে জ্বীনের সাহায্যে এসব করে।

শয়তান জ্বীনরা প্রথম আসমানের দরজার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করত, আল্লাহর বিভিন্ন নির্দেশাবলী শোনার আশায়। সেখানে জিবরীল (আ) আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ নিয়ে উপস্থিত হয়ে প্রথম আসমানের ফেরেশতাদেরকে জানানোর সময় শতান জ্বীনেরা কিছু কিছু শুনে ফেলতো। এরপর একটি কথার সাথে আরো নিরান্নব্বইটি মিথা মিশিয়ে গনকদের কাছে এসে বলতো। রাসূলুল্লাহর নবুয়তের পর থেকে এসকল জ্বীনদেরকে আগ্নিশিখা নিক্ষেপের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সময়ের বিচারে গায়েব আবার দুই রকম। একটা গায়েব হলো ভবিষ্যতের গায়েব, আরেকটি হলো অতীতের গায়েব। অতীতের গায়েব জানাটা সহজ। কারণ জ্বীনরা সাধারণত দীর্ঘজীবি হয়। তারা সুদূর অতীতের সংবাদও জানে। ভবিষ্যতের গায়েব জানাটা কেবল তখনই সম্ভব যখন আল্লাহ তা জানান। আর আল্লাহ ভবিষ্যতের গায়েব অল্প কিছু নবী রসুল বাদে আর কাউকে জানাননি।

তিনি বললেন, কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে বলুন, রাসূলুল্লাহ বললেন- ‘বাদী (দাসী) তার মালিককে জন্ম দিবে

১) শাব্দিকভাবেই দাসী মালিককে জন্ম দিবে। যেমন: দাসীর গর্ভে যে সন্তান জন্ম নেয় সে মালিকের সন্তান হিসেবে দাসির মালিক হয়।

২) উপরের অর্থ থেকে মূলত যুদ্ধ বিগ্রহ বেড়ে যাওয়া ও যুদ্ধবন্দি বেড়ে যাওয়া উদ্দেশ্য

৩) এর রূপক অর্থ হলো মা বাবার প্রতি সন্তানদের দুর্ব্যবহার বেড়ে যাওয়া। একজন মনিব যেভাবে দাসির সাথে দুর্ব্যবহার করে, তেমনি নিজের পেটের সন্তান মায়ের সাথে তেমন আচরণ করবে।

৪) হাদিসের শব্দপ্রয়োগ থেকে বিশেষত মেয়ে সন্তানরা মায়ের অভিভাবক হবে, তাদের দায়িত্ব নিবে ও দুর্ব্যবহার করবে এটা বুঝায়। কেয়ামতের আগে মেয়েরা মায়েদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে যেমন একজন মনিব তাঁর দাসের সাথে করতো জাহেলী ইউরোপে। হাদিসের শব্দ “রব্বাতাহা” মেয়ে বুঝায়, অর্থাৎ, কন্যা সন্তান বড় হওয়ার পর মায়েরা তাদের হাতে নিগৃহীত হবে। আমরা বর্তমানে এই চিত্র দেখতে শুরু করেছি।

ইমাম খত্তাবী জানান, এর অর্থ হলো- সন্তানদের মধ্যে অত্যধিক হারে মাতাপিতার অবাধ্যতা ও তাঁদের প্রতি অসদাচরণ বৃদ্ধি পাবে। সন্তান তাঁর মায়ের সাথে মনিবের মত আচরণ করবে, লাঞ্ছিত করবে গালি দিয়ে, প্রহার করে আর কাজে খাঁটিয়ে। তাই হাদীসে সন্তানকে মায়ের মালিক হবে বলা হয়েছে। অথবা এর অর্থ হলো সন্তানই মায়ের প্রতিপালন করবে। যেভাবে একজন অভিভাবক অধিনস্তদের দেখভাল করে। এটি হাদিসের ঐ অংশের উপলব্ধিমূলক অর্থ।

আর যদি শাব্দিক অর্থ নেয়া হয় তাহলে এর একটি চিত্র বুঝা যায়। যেমন, দাসীর ঘরে জন্ম নেয়া শিশুটি মালিকের সন্তান হিসেবে প্রকারন্তরে ঐ দাসিটির মালিকই বটে। এই ধরণের ঘটনা রাসূলুল্লাহ (স) এর যুগ থেকেই শুরু হয়েছিলো। জাহেলী যুগ থেকেই বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহের ফলে নারীরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে পরিণত হত। ইসলাম সেই নারীদেরকে অধিকার ও সম্মান দেয়ার পদক্ষেপ নিয়েছিলো ধাপে ধাপে। এর প্রথম ধাপ ছিলো তাঁদেরকে নিজেদের পরিবারের সদস্য করে নেয়া। যদিও সামাজিক পরিস্থিতির কারণে সরাসরি তাঁদেরকে বিবাহের মাধ্যমে পরিবারের সদস্য করে নেয়ার মত মানুষের মনমানসিকতা ও অর্থনৈতিক সাবলম্বিতা তখনও তৈরি হয়নি। তাই

অন্যান্য সমস্যার মত ইসলাম এটিকেও ধাপে ধাপে সমাধান করেছে। যেমন, মদ, জুয়া সহ অন্যান্য সমস্যার সমাধান করা হয়েছিলো ধাপে ধাপে। একইভাবে, যুদ্ধবন্দিদেরকে তাদের হারানো অধিকার ফিরিয়ে দিতে ইসলামই প্রথম সাহস দেখিয়েছিলো। অন্যান্য সমাজে যখন এসব যুদ্ধবন্দিদের সাথে পশুর মত আচরণ করা হত তখন ইসলাম এদের জন্য একটি তুলনামূলক ভিন্নতর অধিকার নিশ্চিত করেছিলো। এভাবে যুদ্ধবন্দি নারী মালিকের পক্ষ থেকে সন্তান জন্ম দিলেই সে আরেক ধাপ উন্নতি লাভ করত। তখন তাঁকে আর দাসী বলা হতনা। তাঁকে বলা হয় উম্মুল ওয়ালাদ বা সন্তানের মা। এরপর স্বভাবতই তাঁকে মুক্তি দিয়ে প্রকৃত স্ত্রী করে নেয়ার একটি মনোবাসনা মালিকের মনে জাগবেই। সন্তান জন্ম দেয়া আগেও চাইলে যেকেউ তাঁর দাসীকে মুলতি দিয়ে বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারত। এছাড়া যদি মালিকের জীবদ্দশায় সে মুক্তি নাও পায়, আল্লাহ তাঁর জন্যে এমন এক ব্যবস্থা রেখেছেন যাতে সে চিরস্থায়ী মুক্ত মানুষ হয়ে যেতে পারে। আর তা হলো- মালিকের মৃত্যুর সাথে সাথে উম্মুল ওয়ালাদ আযাদ হয়ে যাবে। স্বাধীন নারী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

ইসলাম মুসলিম খলিফার জন্য যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে চারটি অপশন দিয়েছে।

এক, যদি বাধ্য হয় তাঁদেরকে হত্যা করতে পারবে।

দুই, চাইলে তাঁদেরকে মুক্তিপণের মাধ্যমে মুক্তি দিতে পারবে।

তিন, তিনি চাইলে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দিতে পারবেন।

চার, চাইলে তাঁদেরকে দাস-দাসী হিসেবে মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারবেন।

ইসলামের সকল খলিফাগণই পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতেন। তবে অধিকাংশ সময়েই তাঁদেরকে মুক্তিপণ বা বিনা শর্তেই মুক্তি দেয়া হত।

ইসলাম এভাবে যে দাসপ্রথা ধীরে ধীরে নির্মূল করেছিলো, আখেরী জমানায় সেই দাসপ্রথা আবারো ফিরে আসবে। তখন এ ধরণের ঘটনা অহরহ ঘটতে থাকবে।

এবং (এক কালের) জুতাবিহীন, বস্ত্রহীন দরিদ্র মেষ পালকদেরকে (পরবর্তী কালে) দালানকোঠা নির্মাণ নিয়ে পরস্পর গর্ব করতে দেখবে' নাঙ্গাপা, বস্ত্রহীন মূক-বধিরকে (যার কোন উপযুক্ততা নেই) দেশের রাজা বা শাসক হতে দেখবে।

কিয়ামতচিহ্নের উপর ঈমান রাখার উপকারিতা

(১) ঈমানের প্রধান শাখাগুলোর সাথে কিয়ামতচিহ্নের গভীর সম্পর্ক আছে। যেমন গায়েব বা অদৃশ্যের সাথে এর সম্পর্ক আছে, আবার আখেরাতের সাথে সম্বন্ধিত, আবার রাসূল (স) এর আনিত সংবাদের উপর ঈমান আনার সাথেও এর সূক্ষ্ম যোগসূত্র আছে। তাই কিয়ামতচিহ্নের উপর ঈমান রাখার মাধ্যমে একজন মুসলিমের আক্বীদার সম্পর্ক আরো মজবুত হয়।

সহীহ মুসলিমের হাদীসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন-"যারা আমার উপর ঈমান আনবে ও আমার আনিত বিষয়ের উপর ঈমান আনবে তারাই মুসলিম।" (মুসলিম- ২১)

ইবনে কুদামা (রহঃ) লিখেন- "রাসূলুল্লাহ যা সংবাদ দিয়েছেন আর যা বিশুদ্ধ প্রমাণে আমরা অদৃশ্য কিংবা গায়েব থেকে জেনেছি তার উপর ঈমান আবশ্যক। আমাদের বোধগম্য হোক বা না হোক আমরা বিশ্বাস করি এগুলো সত্য ও বাস্তব। এমনকি এসব ব্যাখ্যাতীত হলেও যেমনঃ মি'রাজ এর ঘটনা, দাজ্জাল ও ঈসা (আ) এর মহারণ, ইয়াজুজ-মা'জুজ ইত্যাদি।"
(লামআতুল ই'তিক্বাদ- ২৪)

কেয়ামতের সংজ্ঞা ও এর নিদর্শনের প্রকারভেদ

আল্লামা ইবনে হাজর (র) বলেন-
"কেয়ামতের আলামত হলো ঐ সকল চিহ্ন যার পর পরই কেয়ামত সংঘটিত হবে।"
(ফাতহুল বারি- ১৩/৭৯)

আল্লামা ত্বিবী লিখেছেন-
"কেয়ামতের নিদর্শন হলো যা হয় এর নিকটবর্তী সময়ে ঘটবে কিংবা কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়কালে ঘটবে, নিকটবর্তী সময়ের উদাহরণ হলো দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ, ঈসা (আ) এর অবতরণ, আর কেয়ামতের প্রাক্কালের উদাহরণ হলো পশ্চিম দিক থেকে সূর্যের উদয়, ধোঁয়া, বিশেষ প্রানী বের হওয়া, মানুষদেরকে একত্রিত কারী আগুন।"
(ফাতহুল বারি- ১৩/৩৫২)

কেয়ামত তিন প্রকারঃ

১) ছোট কেয়ামতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ মৃত্যুকে তার কেয়ামত বলে ধরে নেয়া হয়।

ইমাম কুরতুবী এ বিষয়ে বলেন-
"আমাদের উলামারা জানান, যে ব্যক্তির মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে তার কেয়ামতও আরম্ভ হয়ে গেছে।"
(আশকর প্রণীত 'আত-তাযকিরাহ ফী আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরাহ', পৃষ্ঠা-২)

ঘটনাটি কোরআন বলছে এইভাবে-
"যারা আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা বলতো তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে, যখন তাদের কাছে হঠাৎ করে মৃত্যু আপতিত হবে" (সূরা আনআম- ৩১)

২) মধ্যম কেয়ামতঃ প্রতিটি প্রজন্মের বিলুপ্তি সেই প্রজন্মের কেয়ামত হিসেবে গণ্য হয়।
যেমন বালক আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইসকে দেখে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছে-
"যদি এই বালকটি দীর্ঘায়ু হয় তবে তার মৃত্যু না হওয়া অবধি (এই প্রজন্মের) কেয়ামত সম্পাদিত হবেনা।"
(মুসলিম [নববী]- ১৮/৯০)

৩) বড় বা প্রধান কেয়ামতঃ চূড়ান্ত কেয়ামত যান মাধ্যমে সকল মানবকূলকে হিসাব নিকাশের জন্যে জড়ো করা হবে। এই প্রকারটিকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন-
"পাপ ও অনাচারের সয়লাব না হওয়া অবধি কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবেনা।"
(মুসনাদ আহমাদ- ২/১৬২)

কেয়ামতের আলামতের প্রকারঃ

ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আলেমগণ আলামতের বেশ কয়েক ধরণের প্রকার নির্বাচন করেছেন।

(১) গুরুত্বের দিক বিবেচনায় দুই প্রকারঃ

(ক) ছোট আলামতঃ ঐ সকল আলামত যা কেয়ামত হওয়ার অনেক কাল আগে থেকেই শুরু হয়েছে। এবং যা দেখতে স্বাভাবিক ঘটনার মতই। যেমনঃ ইলম কমে যাওয়া, মূর্খতা বেড়ে যাওয়া, মদপান বৃদ্ধি পাওয়া, উঁচু দালান নির্মাণে প্রতিযোগীতা ইত্যাদি। এর কিছু কিছু আলামত কেয়ামত শুরু হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে।

(খ) বড় আলামতঃ ঐ সকল ঘটনা যা একেবারে শেষ সময়ে ঘটবে। এবং যা অস্বাভাবিক হবে। যেমনঃ দাজ্জালের প্রকাশ, ইমাম মাহদীর আবির্ভাব, ঈসা (আ) এর অবতরণ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যের উদয় ইত্যাদি।

(২) বাস্তবায়ন বিবেচনায় চার প্রকারঃ

(ক) ছোট আলামত যা ঘটে গেছে এবং যার পুনরাবৃত্তি হবেনা। যেমনঃ রাসূল্লাহর (স) আগমন ও মৃত্যু, বায়তুল মাক্বদিসের বিজয়, হিজাযের আগুন ইত্যাদি।

(খ) ছোট আলামত যা ঘটেছে ও প্রতিনিয়ত পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। যেমনঃ ভূমিকম্পের আধিক্য, আমানতের খেয়ানত, অযোগ্যের নেতৃত্ব, মাসজিদকে চলাচলের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা, জ্ঞানের হ্রাস ও মূর্খতার বিস্তার ইত্যাদি।

(গ) ছোট আলামত যা এখনো সংঘটিত হয়নি। যেমনঃ অন্তর ও মুসহাফ থেকে কোরআন মুছে যাওয়া, কা'বার ধ্বংস, আরব ভূখণ্ড সবুজ হয়ে উঠা, ফোরাতের বুকে স্বর্ণের পাহাড় জেগে উঠা ইত্যাদি।
(ঘ) বড় আলামত যা শেষ জমানায় সংঘটিত হবে। যেমনঃ ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব, কথা বলা প্রাণীর প্রকাশ ইত্যাদি।
(ফাতহুল বারি- ১৩/৮৫, আল ইশাআহ, পৃষ্ঠা- ২৯/ ১৫৩/ ১৯১, লাওয়ামিউল আনওয়ার- ২/৬৬, আল ইরশাদ- ১৯৭)

(৩) স্থান বিবেচনায় দুই প্রকারঃ

(ক) আসমানীঃ যে আলামতসমূহের ঘটনাস্থল আকাশ ও তদসংলগ্ন বস্তুতে। যেমনঃ চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া, একদিনের চাঁদকে আকারে বড় দেখতে পাওয়া, পশ্চিম থেকে সূর্য উদিত হওয়া।

(খ) জমিন সংশ্লিষ্টঃ যে আলামতসমূহ পৃথিবীর জমিনে সংঘটিত হবে। যেমনঃ মিথ্যা নবুয়ত দাবীদার, মু'মিনদের জান কবজকারী বায়ু ইত্যাদি।
(নিহায়া-১/২১৪, ফাতহুল বারি-১১/৩৫৩)

(৪) ফলাফল বিবেচনায় ৩ প্রকার।

(ক) উপকারীঃ যে সকল আলামত মুসলিম উম্মাহর জন্য উপকারী। যেমনঃ ইমাম মাহদীর আগমন, প্রাচুর্য্য ইত্যাদি।

(খ) অপকারীঃ যা ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য অপকারী হবে। যেমনঃ দাজ্জাল, ইয়াজুজ মাজুজ, হত্যা ইত্যাদি।

(গ) নিরপেক্ষঃ যা নিরপেক্ষভাবে সবার জন্যে ভালো। যেমনঃ বই পুস্তকের আধিক্য, কলমের ব্যবহার বৃদ্ধি, ইত্যাদি।

প্রকারগুলোর ভিন্নতা থেকে বুঝা যায় এসবের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে কিছু শিক্ষা দিতে চান।

আমাদের আলোচিত হাদিসে কেয়ামতের যে কয়টি আলামত উল্লেখ হয়েছে সবগুলোই ছোট আলামত। যেগুলো অনেককাল আগে থেকেই শুরু হয়েছে। এর একটি আমরা আলোচনা করেছি- দাসী তাঁর মালিককে জন্ম দেবে। আর শেষের আলামতটি সাধারণ মানুষের যে মন্দ জিনিস তা কিন্তু না। কিন্তু

অযোগ্যরা যদি এই অঢেল সম্পদের সংস্পর্শে আসে তাহলে তা কেয়ামতের আলামতে পরিণত হয়। তা হলো এককালের হতদরিদ্র রাখালরা পরবর্তী সময়ে দালান-প্রাসাদ নির্মাণে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হবে। এই বিষয়টি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, কেয়ামতের আগে মানুষের স্বভাব বদলে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা। সাধারণ রাখালের তেমন কোনো চাহিদা থাকেনা। কিন্তু সেই রাখালই যখন সুউচ্চ দালানের প্রতিযোগীতায় নামবে বুঝা যাচ্ছে একেবারে নিম্নবিত্ত শ্রেণী কিংবা আরো দরিদ্র মানুষগুলোর চাহিদাও আকাশচুম্বী হয়ে যাবে।

এই রাখালের চারটি বৈশিষ্ট বলা হয়েছে, ছিন্নবস্ত্র, নগ্নপা, দরিদ্র ও রাখাল। সবগুলোই একেবারে নিম্নস্তরের বৈশিষ্ট। অথচ এই নম্নস্তরের মানুষই একেবারে উচ্চ সুশীল শ্রেণী হয়ে উঠবে। একইভাবে আরো বুঝা যায় যে এইসব রাখাল উচ্চবংশের হবেনা, কিন্তু পরে হয়ে উঠবে শহরের হর্তাকর্তা। এখানেই আরেকটি আলামত পাওয়া যায়। তা হলো- রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- যখন দেখবে অযোগ্য ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দেখভাল করছে, তাহলে কেয়ামতের অপেক্ষা করো।

সাদা চোখে এই আলামতটিকে ভালও বলা যায়না, খারাপও বলা যায়না। এটি স্বাভাবিক ঘটনা প্রবাহ হিসেবেই ঘটবে। কিন্তু যখন এসব ফুলেফেপে উঠা রাখালরা তাদের যোগ্যতার বাহিরের দায়িত্বে চলে আসবে তখন এটি মন্দ হিসেবে ধর্তব্য। যেমনটা উলামাগণ বলেছেন যে, এমনটা ঘটলে এসব রাখালদের হাতেই এক সময় ভালো মানুষরা নিগৃহীত হবে, বিশ্বস্তরা প্রতারিত হবে, গরিবরা অধিকার হারাবে। সম্পদের অপব্যয় হবে। আরো যা কিছু হবে তা তো আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে শুরু করেছি।

এমনকি রাসূলুল্লাহ (স) সতর্ক করে বলেছেন- কেয়ামতের আগে মসজিদগুলোও উচু উচু করে বানানো হবে।

হজরত উমর (রা:) বলেন, "অতপর লোকটি চলে গেলেন এবং আমি অনেকক্ষণ তথায় অপেক্ষা করলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ আমাকে বললেন; 'উমর! প্রশ্নকারী লোকটিকে চিনলে?' আমি বললাম, '(না হুজুর) আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই তা জানেন'। রাসূল বললেন; 'তিনি হচ্ছেন হজরত জিবরাইল (আ:)।

- হাদিসে বর্নীত চারটি প্রশ্নকে দীন বলা হয়েছে। তাই শুধুমাত্র ইসলাম ও ঈমান ও ইহসানই যথেষ্ট না, বরং কেয়ামতের আলামতের জ্ঞান ও জমানার ফিতনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকাও দ্বীনের অংশ।

ইবনুল মুনির বলেনঃ রাসূলের (স) উক্তি "তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছেন" বুঝাচ্ছে সুন্দর প্রশ্নও ইলম ও তালিম হিসেবে গণ্য। কারণ জীবরীল (আ) কেবল প্রশ্নই করে গেছেন, এরপরেও রাসূলের ভাষায় তিনি শিক্ষা দিতে এসেছেন। এ কারনেই বলা হয়ে থাকে- সুন্দর প্রশ্ন হলো জ্ঞানের অর্ধেক।

সুতরাং তোমরা তাঁর থেকে শিখে নাও, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, আজকে তিনি যে রূপে এসেছেন এর আগে কখনও সেই রূপ ধারণ করেন নি। তিনি চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমি চিনতেও পারিনি।

ইবনুল কয়্যিম (রহ) বলেনঃ ফেরেশতা ও জ্বীনের দেখা পাওয়া সম্ভব আল্লাহ যাকে দেখাতে চান তাঁর জন্য।

শাইখ আব্দুল্লাহ সিদ্দিক আল-গমারি আল-হুসনি বলেনঃ এই ঘটনা থেক প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতারা কখনও সালেহ বান্দাদের কাছে প্রকাশ হতে পারেন ও কথাবার্তা বলতে পারেন। এর আগেও জীবরীল (আ) হাজেরা (আ) এর কাছে প্রকাশ হয়েছিলেন এবং সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে তোমার এ সন্তান তাঁর পিতার সাথে কাবা নির্মাণ করবে। এটি হাজেরার কারামত ছিলো। তিনি নবী ছিলেন না।

وهكذا الحُفاة العُراة العالة، وهم العرب؛ كان يغلب عليهم أنهم حُفاة عُراة عالة، غالب العرب البادية هكذا، يغلب عليهم أنهم حُفاة عُراة عالة فقراء، حتى أكرمهم الله بهذا الدين، وصاروا ملوك الناس، وأغناهم الله بعد ذلك، صاروا رؤوس الناس، وصاروا يتطاولون في البنيان؛ يبنون البنايات العظيمة، والبيوت الكثيرة، بعدما وسَّع الله عليهم، وقد وقع هذا كله، بدأ في عهده وبعده في عهد خلفائه وبعده.

সামারিঃ

হাদিসে জিবরিল বা উম্মুস সুন্নাহ নিয়ে আমাদের প্রথম আলোচনা ছিল সনদ নিয়ে। মুহাদ্দিসদের হাদিস জমা করার ক্ষেত্রে দুই ধরণের প্রক্রিয়া দেখা যায়। একটি হলো, একই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সব হাদিস একটি অধ্যায়ে জমা করা। দ্বিতীয়টি হলো, একটি হাদিসের সবগুলো সনদ একটি অধ্যায়ে জমা করা। আমরা হাদিসে জিবরিলে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে এর সবগুলো সনদ জমা করেছি। সেই সাথে হাদিসটির সবগুলো প্রেক্ষাপটও জমা করেছি। হাদিসে জিবরিল নিয়ে ইতিপূর্বে এভাবে কোন বিশদ সংকলন হয়নি। তাই আমরা একাজটি করার প্রয়াস পেয়েছিলাম।

হাদিসে জিবরিলের শুরুতে আমরা জিবরিল (আ) এর আগমন, তাঁর পোশাক, বৈশিষ্ট ও আচরণ নিয়ে বিশ্লেষণ করেছি। এক্ষেত্রে স্মরণীয় বিষয় হলো, তিনি একইসাথে বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। একটি বৈশিষ্ট তাঁকে অপরিচিত থাকতে সহায়তা করেছে, আরেকটি বৈশিষ্ট তাঁর মধ্যে তালেবে ইলমের গুনাগুণ ফুটিয়ে তুলেছে। এখান থেকে আমরা আরেকটি বিষয়ের দিকে যেতে চাই। তা হলো ঈমান নিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উলামাদের মধ্যে একটি মতবিরোধ। বিষয়টি হলো- ঈমান কি বাড়ে-কমে? হ্রাস-বৃদ্ধি পায় নাকি একই রকম থাকে? একদল উলামাদের মতে ঈমান হ্রাস বৃদ্ধি পায়, আরেকদল উলামাদের মতে ঈমান

নিশ্চল, বাড়েও না, কমেও না। এটা নিয়ে প্রায়ই আপনারা চরম বিতর্ক শুনে থাকবেন, বা এখনও না শুনে থাকলে সামনে শুনতে পাবেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো- এ দুই মতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। উভয় পক্ষই দুইটি আলাদা কনসেপ্ট বা দৃষ্টিভঙ্গিতে দুই রকমের মত দিয়েছেন। যেমনটা আমরা দেখেছি জিবরিল (আ) দুইটি ভিন্ন উদ্দেশ্যে দুই রকমের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছিলেন। ঐ দুই বৈশিষ্ট আদতে দেখতে বিপরীতধর্মী মএন হলেও তা ছিলো আসলে একটু সামগ্রিক উদ্দেশ্যকে সফল করার লক্ষ্যে। কোরআনের দুইটি আয়াতের মধ্যে বিরোধ দেখতে পায় যাদের ইলমে কমতি আছে, দুইটি হাদিসের মধ্যে বিরোধ দেখতে পায় যাদের ইলমের গভীরতা নেই, একইভাবে উলামাদের মতামতের মধ্যে সমন্বয় তৈরির বদলে বিরোধ খুঁজতে চায় যাদের ইলমী অন্তর সংকীর্ণ। আমরা জানি ছোট স্থানে বেশিকিছুর স্থান হয়না, প্রশস্ত স্থানে সবকিছু ধরে। তাই ইলমের জগতে কামিয়াব হতে অন্তরকে প্রশস্ত করার বিকল্প নেই। আসুন আমরা এবার ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ও নিশ্চলতার মধ্যে সমন্বয় করার বিষয়টি জানি। আপনারা সাধারণত এই বিষয়টি কারো কাছে শুনবেন না। কথাগুলো অনেক আলেমই বলেন না বা জানেন না। যাই হোক।

যে পক্ষ বলেন ঈমান বাড়েনা বা কমেওনা- তাঁদের উদ্দেশ্য হলো ঈমানের প্রথম বিন্দুর কথা। আমরা জানি কোন কিছু সৃষ্টি হতে হলে তা একটি সূচনা বিন্দু থেকে শুরু হতে হয়। আর কেউ যখন ঈমান আনে তখন তাঁর মধ্যে ঈমানের একটি বিন্দু তৈরি হয়। এখন সেই মৌলিক বিন্দুটির হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়ার উপায় নেই। কারণ অনু বা পরমাণুর আকার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়না। তবে এর সাথে আরো অনু পরমাণু বা যোগ হতে পারে, কিন্তু মূল পরমাণু কখনও আকারে বৃদ্ধি পাবেনা। আর যারা বলছে ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি হয় তাদের উদ্দেশ্য হলো ঐ মূল বিন্দুর উপর আরো বাড়তি ঈমান যোগ হতে পারে, আবার যোগ হওয়া ঈমান আমলের কমতির কারণে কমতেও পারে। তাই হাদিসে এসেছে, যার মধ্যে তিল পরিমাণ ঈমান থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কোরআনও বলে যে, আল্লাহ ঈমানকে মুমিনদের অন্তরে লিখে দিয়েছেন। আবার কোরআন এটাও বলছে, যখন কোরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। এভাবেই মূলত সবগুলো আয়াত-হাদিস-মতামতের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব।

সফরের উপকারিতাঃ
সফর ব্যক্তির চরিত্রকে উন্মোচন করে, নিজের অদেখা দিকগুলো প্রকাশ করে। ধর্য্যের যোগ্যতা সৃষ্টি করে। পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াতে দেশ-বিদেশে ভ্রমণের প্রতি তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘বলো, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো, তোমাদের আগের লোকদের কী পরিণাম হয়েছিল! তাদের বেশির ভাগই ছিল মুশরিক। ’ (সুরা : রুম, আয়াত : ৪২)

মূলত সফরের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের নানা বৈচিত্র্য বিষয় অবলোকন করে জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করা খুবই সহজ। সফরের কারণে মানুষের চোখ-কান খুলে যায়। সত্য, সঠিক পথ ও পন্থা গ্রহণে সহায়ক হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তবে কি তারা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে না, যাতে তাদের অন্তর অনুধাবন করতে পারত এবং তাদের কান (সত্য কথা) শুনে নিত। ’ (সুরা : হজ, আয়াত : ৪৬)

নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থেকে বের না হলে সৃষ্টিজগতের অনেক কিছুই অজানা থেকে যায়। পৃথিবীর একেক স্থান একেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। চিত্তবিনোদনের পাশাপাশি সেসব স্থানে চিন্তাশীলদের জন্যও রয়েছে চিন্তার খোরাক। আল্লাহ বলেন, ‘বলে দাও, তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করো এবং দেখো, কিভাবে আল্লাহ প্রথমবারে সৃষ্টি করেছেন। আবার তিনি শেষবারেও সৃষ্টি করবেন। ’ (সুরা : আনকাবুত, আয়াত : ২০)

সফরের প্রতি ইসলাম কখনো নিরুৎসাহ করেনি। ইসলামের একটি অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ হলো হজ। আর হজ পালন করতে হয় দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে। ইসলামের আরেকটি রুকন হলো জাকাত। জাকাত আদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো বিত্তহীন মুসাফিরকে দান করা। কারো যাত্রাপথকে মসৃণ করা। এ ছাড়া নির্দিষ্ট পরিমাণ সফরের কারণে শ্রেষ্ঠতম ইবাদত নামাজকে সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবেই বিভিন্ন উপায়ে ইসলাম ভ্রমণের প্রতি উৎসাহিত করেছে। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) ভ্রমণের পাঁচটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন। এক. দুশ্চিন্তা দূর হয়। দুই. জীবিকা অর্জন করা যায়। তিন. জ্ঞানার্জন করা যায়। চার. সৌজন্যতা ও শিষ্টাচার শেখা যায়। পাঁচ. শারীরিক সুস্থতা অর্জন হয়।
রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, তোমরা ভ্রমণ করো, সুস্থ থাকবে এবং তোমরা গণিমত লাভ করবে। (সিলসিলাতুল আহাদিস, হাদিস নং-২৫৫) তিনি আরো বলেন, ‘তোমরা ভ্রমণ করো, সুস্থ থাকবে এবং তোমরা যুদ্ধে শরিক হও, গনিমত লাভ করবে।’ (সিলসিলাতুল আহাদিস, হাদিস নং-৩৩৫২)
‘সফর’ বা ভ্রমণ পৃথিবীর আদিকাল থেকে চলে আসছে। নবী রাসূলরা মহান আল্লøাহর নির্দেশে বিভিন্ন জনপদ ও লোকালয়ে সফর করে ‘দাওয়াতি মিশন’ বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীরা ধর্ম প্রচারে কিংবা ধর্ম ও জীবন বাঁচানোর তাগিদে আল্লøাহর নির্দেশে সফর তথা হিজরত করেছেন। বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ সা:-কে মহান আল্লাহ মিরাজ রজনীতে ঊর্ধ্বাকাশে একান্তে নিজের কাছে ‘সফর’ করিয়েছেন। তাই তো পৃথিবীর আদি থেকে অদ্যাবধি ইতিহাসের পাতায় অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী, পণ্ডিত, নবী-রাসূলের নাম পাওয়া যায়, যাঁরা পৃথিবীর নানা প্রান্ত ভ্রমণ করে ভ্রমণেতিহাসে চির স্মরণীয় ও অমর হয়ে আছেন।

সফর বা ভ্রমণের প্রকারভেদ :

সফর বা ভ্রমণকে কুরআন-হাদীছের আলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. হারাম বা নিষিদ্ধ সফর। ২. মাকরূহ বা অপসন্দনীয় সফর। ৩. মুবাহ বা জায়েয সফর। ৪. মুস্তাহাব বা পসন্দনীয় সফর। ৫. ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় সফর।[৭]

(১) হারাম বা নিষিদ্ধ সফর : এটা হ’ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধিতা বা নিষিদ্ধ কাজ সম্পন্ন করার জন্য সফর করা। যেমন- কুরআন-হাদীছে নিষিদ্ধ এমন কাজ সম্পন্ন করার জন্য সফর করা এবং যেখানে মহামারী আরম্ভ হয়েছে এমন স্থান থেকে সফর করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ‘যদি তোমরা শুনতে পাও (কোন

স্থানে মহামারী আক্রান্ত হয়েছে) তাহ'লে সেখানে যেয়ো না। আর তোমরা যেখানে আছ সেখানে আক্রান্ত হ'লে সেখান থেকে বের হয়ো না'।[৮]

এছাড়া কোন মহিলার মাহরাম ছাড়া সফর করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ- 'মহিলারা মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যতীত অন্য কারো সাথে সফর করবে না। মাহরাম কাছে নেই এমতাবস্থায় কোন মহিলার নিকট কোন পুরুষ গমন করতে পারবে না'।[৯]

(২) মাকরূহ বা অপসন্দনীয় সফর : এটা হ'ল ইসলামী পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে সফর করা। যেমন- একাকী রাতে সফর করা, তিন জনের অধিক হ'লে কাউকে আমীর নিযুক্ত না করে সফর করা। ইবনে ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ، 'যদি লোকেরা একা সফরে কি ক্ষতি আছে তা জানত, যা আমি জানি, তবে কোন আরোহী রাতে একাকী সফর করত না'।[১০]

(৩) মুবাহ বা বৈধ সফর : দুনিয়ার হালাল কোন কাজের প্রয়োজনে সফর করা। যেমন বিনোদনের জন্য, ব্যবসায়িক কাজে বা কোন দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য সফর করা ইত্যাদি।

(৪) মুস্তাহাব বা পসন্দনীয় সফর : এটা হ'ল মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আক্বছার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা। রাসূল ছোঃ) বলেন, لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، 'মসজিদুল হারাম, মসজিদুর রাসূল (ছাঃ) এবং মসজিদুল আক্বছা (বাইতুল মাক্বদিস) তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না।[১১]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, 'উপদেশ গ্রহণের জন্য, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ ও তাদের স্মৃতিসমূহ দেখার জন্য সফর করা মুস্তাহাব'।[১২]

(৫) ওয়াজিব বা অবশ্যিক সফর : এটা হ'ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর কোন আদেশকে বাস্তবায়নের জন্য সফর করা। যেমন- হজ্জের জন্য মক্কা সফর করা এবং মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক যুদ্ধের আদেশ দিলে যুদ্ধের জন্য সফর করা ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ- 'আর তুমি জনগণের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ'তে' (হজ্জ ২২/২৭)।

ফরয ইলম অর্জন করার জন্য যে কোন স্থানে ভ্রমণ করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، ‘কোন ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করলে, আল্লাহ এই অসীলায় তার জন্য জান্নাতের একটি পথ সুগম করে দেন’।[১৩]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সফরসমূহ চার ধরনের ছিল। হিজরতের জন্য সফর[১৪], জিহাদের জন্য সফর, আর এটাই বেশী ছিল[১৫], ওমরাহ-এর জন্য[১৬] এবং হজ্জের জন্য সফর।[১৭]

সফরের আদব সমূহ :

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইসলাম সফরের কিছু ইসলামী নিয়ম-কানূন প্রবর্তন করেছে। যা পালন করলে সফরের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। সফরের আদবগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে- ১. সফরে বের হওয়ার পূর্বের আদব। ২. সফর অবস্থায় আদব। ৩. সফর থেকে ফেরার পথে আদব। এখানে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলিকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

সফরে বের হওয়ার পূর্বের আদব :

সফরে বের হওয়ার পূর্বে ইসলামে কিছু নিয়ম রয়েছে, যা পালনের মাধ্যমে একজন মুসাফির তার সফরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।

বিশুদ্ধ নিয়ত করা :

প্রত্যেক আমলের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।[১৮] মুসলিমের প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হ’তে হবে (যুমার ৩৯/২; আল-বাইয়নাহ ৯৮/৫; গাফির ৪০/৬৫)। সুতরাং সফরের পূর্বে বিশুদ্ধ নিয়ত করা যরূরী। বিশেষ করে হজ্জ, ওমরাহসহ অন্যান্য উত্তম সফরে। ভাল নিয়তের মাধ্যমে প্রার্থিব সফরও ইবাদতে পরিণত হ’তে পারে। যেমন- কেউ ব্যবসায়িক সফরের পূর্বে যদি নিয়ত করে যে, হালালভাবে ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত লাভের কিছু অংশ গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে, তাহ’লে সফরটি ইবাদত হবে। আবার নিয়তের কারণে ইসলামী সফরও শিরকী কাজে পরিণত হ’তে পারে এবং জাহান্নামে যাওয়ার কারণও হ’তে পারে। লোক দেখানো হজ্জ ও ওমরাহ করা। নাম-যশের উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জনের জন্য বের হওয়া (হূদ/১৫-১৬)।

ইস্তেখারার মাধ্যমে সফর শুরু করা :

ইস্তেখারা হ’ল কল্যাণ প্রার্থনা। মানুষ যেহেতু তার ভবিষ্যৎ জানে না, তাই নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ আল্লাহর উপরে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অথবা কোন ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য ছালাতুল ইস্তেখারা আদায় করতে হয়। দিনে বা রাতে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করবে এবং ছালাতের সিজদায়, শেষ বৈঠকে অথবা সালাম ফিরানোর পরে নিম্নেণর দো‘আটি পড়বে।[১৯]

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيْهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ، وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدِرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ-

‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণের প্রার্থনা করছি এবং তোমার শক্তির মাধ্যমে শক্তি প্রার্থনা করছি। আমি তোমার মহান অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইছি। কেননা তুমিই ক্ষমতা রাখ, আমি ক্ষমতা রাখি না। তুমিই জান, আমি জানি না। তুমিই অদৃশ্য বিষয় সমূহের মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ! যদি তুমি জান যে, এ কাজটি (এখানে যে কাজের জন্য ইস্তেখারা করা হচ্ছে তা মনে মনে উল্লেখ করবে) আমার জন্য উত্তম হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ’লে ওটা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও এবং সহজ করে দাও। অতঃপর ওতে আমার জন্য বরকত দান কর। আর যদি তুমি জান যে, এ কাজটি আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ’লে এটা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও ওটা থেকে ফিরিয়ে রাখ। অতঃপর আমার জন্য মঙ্গল নির্ধারণ কর, যেখানে তা আছে এবং আমাকে তা দ্বারা সন্তুষ্ট কর’।[২০]

আল্লাহর নিকট সমস্ত পাপ থেকে তওবা করা :

প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনায় বহু মানুষ মারা যাচ্ছে। মানুষ জানে না কখন কোথায় তার মরণ হবে; বরং আল্লাহই জানেন (লোক্বমান ৩১/৩৪)। তাই সফরের পূর্বে আল্লাহর কাছে সমস্ত গোনাহ থেকে তওবা করা উচিত। সাথে সাথে কারো উপর যুলুম করে থাকলে মাফ চেয়ে নেওয়া এবং ঋণ থাকলে পরিশোধ করা বা জানিয়ে যাওয়া উচিত।

হালাল পাথেয়র ব্যবস্থা করা :

সফরে যাওয়ার আগে পরিবারের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি সফরের জন্য হালাল পাথেয়র ব্যবস্থা করা। হালাল রূযী ছাড়া কোন ভাল কাজই আল্লাহ কবুল করেন না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ وَلاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا) وَقَالَ (يأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثم ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ. يَا رَبِّ. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِه لِذَلِكَ؟

‘আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত কবুল করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই আদেশই দিয়েছেন, যে আদেশ রাসূলগণকে দিয়েছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্ত্ত আহার কর এবং নেক আমল কর’ (মুমিন ৪০/৫১)। তিনি আরো বলেন, ‘হে মুমিনগণ! আমরা তোমাদের যে পবিত্র জীবিকা দান করেছি তা থেকে আহার কর’ (বাক্বারাহ ২/১৭২)। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে বের হয় এবং তার চুলগুলো এলামেলো হয়ে আছে ও কাপড় ধুলোমলিন। অতঃপর সে তার দু’হাত আকাশের দিকে তুলে বলে, হে রব! হে রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম, সে হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। এ অবস্থায় কেমন করে তার দো‘আ কবূল হ’তে পারে’?[২১]

দেনা-পাওনা ও অছিয়ত লিখে রাখা :

সফরের পূর্বে কর্তব্য হ’ল দেনা-পাওনা অথবা অছিয়ত থাকলে লিখে রাখা। কেননা মানুষ জানে না সে কোথায়, কখন মারা যাবে (লোক্বমান ৩১/৩৪)। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ، يُوْصِيْ فِيْهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ، ‘কোন মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার কাছে অছিয়তযোগ্য কিছু (সম্পদ) থাকাবস্থায় সে দু’রাত কাটাবে অথচ তার নিকট অছিয়ত লিখিত থাকবে না’।[২২]

পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে সফরে বের হওয়া :

পিতা-মাতা জীবিত থাকলে তাদের অনুমতি নিয়ে সফরে যাওয়া উত্তম। আর মহিলা হ’লে তার অভিভাবকের অনুমিত এবং স্বামী বা মাহরাম (যার সাথে বিবাহ হারাম, যেমন-পিতা, ভাই, চাচা, ছেলে ইত্যাদি) সহ সফরে বের হওয়া। ইবনু আববাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ فِيْ جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِيْ تُرِيْدُ الْحَجَّ. فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا-

‘মহিলারা মাহরাম ব্যতীত সফর করবে না। মহিলার মাহরাম ব্যতীত কোন পুরুষ তার নিকট গমন করবে না। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! অমুক অমুক সেনাদলের সাথে আমি জিহাদ করতে যাচ্ছি। কিন্ত আমার স্ত্রী একাকিনী হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে যাও’।[২৩] মহিলাদের জন্য হজ্জের সফরেও মাহরাম থাকা যরূরী।

ব্যবস্থা থাকলে স্ত্রী সাথে নেওয়া :

দীর্ঘ দিনের উদ্দেশ্যে সফরকালে সম্ভব হ'লে ও ব্যবস্থা থাকলে স্ত্রীকে সাথে নেওয়া। আর কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে এবং সে একজনকে সাথে নিতে চাইলে অথবা একজনের যাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে লটারীর মাধ্যমে একজনকে নির্ধারণ করবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ 'রাসূল (ছাঃ) সফরের মনস্থ করলে স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী করতেন। যার নাম আসত তিনি তাঁকে নিয়েই সফরে বের হ'তেন'।[২৪] তবে হজ্জের সফরে তিনি সকল স্ত্রীকে সাথে নিয়েছিলেন।[২৫]

সৎ কর্মশীল ব্যক্তির নিকট থেকে উপদেশ নেওয়া :

সফরে বের হওয়ার পূর্বে সফর স্থান সম্পর্কে অভিজ্ঞ অথবা সৎ ও পুণ্যবান লোকেদের নিকট থেকে উপদেশ নেওয়া যেতে পাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি, অতএব আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেন, عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ. فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ- 'অবশ্যই তুমি আল্লাহভীতি (তাক্বওয়া) অবলম্বন করবে এবং প্রতিটি উঁচু স্থানে ওঠার সময় তাকবীর ধ্বনি দিবে (আল্লাহ আকবার বলবে)। লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল সে সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! তার পথের ব্যবধান কমিয়ে দাও এবং তার জন্য সফর সহজতর করে দাও'।[২৬]

সম্ভব হ'লে বৃহস্পতিবার বের হওয়া :

বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া উত্তম। কা'ব বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَّخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ- 'নবী করীম (ছাঃ) তাবূক অভিযানে বৃহস্পতিবারে বের হ'লেন। আর তিনি বৃহস্পতিবার (সফরে) বের হওয়া পসন্দ করতেন'।[২৭] অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ) বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য দিনে কমই সফরে বের হ'তেন।[২৮]

দিনের প্রথম অংশে সফর আরম্ভ করা :

অন্যান্য কাজের ন্যায় সকাল সকাল সফরে বের হওয়াও সফরের অন্যতম আদব। ছাখার ইবনে আদা'আহ গামেদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

اَللهم بَارِكْ لِأُمَّتِي فِيْ بُكُوْرِهَا. وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشاً بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ. وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِراً، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ،

‘হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের জন্য তাদের সকালে বরকত দাও। আর তিনি যখন ছোট-বড় কোন অভিযানে সৈন্যবাহিনী পাঠাতেন, তখন তাদেরকে সকালে পাঠাতেন। আর ছাখার ব্যবসায়ী ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর ব্যবসার পণ্য সকালেই প্রেরণ করতেন। ফলে তিনি (এর বরকতে) ধনী হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রচুর সম্পদ হয়েছিল’।[২৯]

রাত্রিতে সফর করা :

প্রয়োজনে রাতের বেলায়ও সফর করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ ‘তোমাদের ফজরের পূর্বে অন্ধকার অবস্থায় সফর করা উচিত। কেননা রাতের বেলা যমীন সংকুচিত হয়’।[৩০] গ্রীষ্মকালে রাতের বেলা মরুভূমির পরিবেশ ঠান্ডা থাকে এবং দিনের বেলা থাকে উত্তপ্ত। যখন চলাচল কষ্টসাধ্য। ফলে রাত্রে ভ্রমণ সহজতর হয় এবং বাহনও স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারে।[৩১]

বিদায়কালীন দো‘আ পাঠ করা :

আত্মীয়-স্বজনের অর্থাৎ যারা বাড়ীতে থাকবে তাদের থেকে বিদায় নেয়ার সময় নিম্নোক্ত দো‘আ পাঠ করে বিদায় নিবে-

أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِيْ لاَ تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ،

উচ্চারণ: ‘আস্তাউদি‘উকাল্লাহাল্লাযী লা-তাযি‘উ ওয়াদা-ই‘য়াহু’। অর্থ- ‘আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর হেফাযতে রেখে যাচ্ছি যার হেফাযতে অবস্থানকারী কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না’।[৩২] আর যারা মুসাফিরকে বিদায় দিবে তারা নিম্নোক্ত দো‘আটি পাঠ করে বিদায় দিবে।

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ،

উচ্চারণ: আস্তাউদি‘উল্লা-হা দীনাকা ওয়া আমা-নাতাকা ওয়া খাওয়া-তীমা আ‘মা-লিকা’। অর্থ- ‘আপনার দ্বীন, আপনার আমানত সমূহ ও আপনার শেষ আমল সমূহকে আল্লাহর হেফাযতে ন্যস্ত করলাম’।[৩৩] এছাড়া নিম্নের দো‘আটিও পাঠ করা যায়, যা রাসূল (ছাঃ) জনৈক ছাহাবীকে বলেছিলেন, যিনি রাসূল (ছাঃ)-কে সফরে যাওয়ার কথা বলেছিলেন,

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ

উচ্চারণ: যাওয়াদাকাল্লা-হুত তাক্বওয়া ওয়া গাফারা যাম্বাকা ওয়া ইয়াস্সারা লাকাল খায়রা হায়ছুমা কুনতা। অর্থ- ‘আল্লাহ তোমাকে তাক্বওয়ার পুঁজি দান করুন, তোমার গোনাহ মাফ করুন এবং তুমি যেখানেই থাক তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দেন’।[৩৪]

বিদায়কালে পরিবার-পরিজনকে তাক্বওয়ার অছিয়ত করা :

সফরকারী পরিবার প্রধান হ'লে পরিবারের ভাল-মন্দ তার উপর নির্ভরশীল। আর আল্লাহর দরবারে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৩৫] আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির সকলকে লক্ষ্য করে বলেন,

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللهَ وَإِن تَكْفُرُوْا فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللهُ غَنِيّاً حَمِيْداً-

'আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর যদি কুফরী কর তাহ'লে আসমানসমূহে যা আছে এবং যা আছে যমীনে সব আল্লাহরই। আর আল্লাহ অভাবহীন, প্রশংসিত' (নিসা ৪/১৩১)।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দো'আ পাঠ করা :

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলূল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলবে, بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি ওয়া লা হাওলা ওলা-লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ। অর্থঃ 'আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। আল্লাহ ব্যতীত কোন ক্ষমতা নেই, কোন শক্তি নেই'। তাকে বলা হবে এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে, তোমাকে বাঁচানো হয়েছে, তোমাকে সুপথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন শয়তান তার কাছ থেকে দূরে চলে যায়। এক শয়তান অপর শয়তানকে বলে, তুমি ঐ ব্যক্তির সাথে কি করতে পার? যাকে সুপথ দেখানো হয়েছে এবং সব রকমের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা হয়েছে'।[৩৬]

উম্মু সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলূল্লাহ (ছাঃ) যখন ঘর থেকে বের হ'তেন তখন বলতেন,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا-

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি আল্লা-হুম্মা ইন্না না'উযুবিকা মিন আন নাযিল্লা আও নাযিল্লা আও নাযলিমা আও নুযলামা আও নাজহালা আও ইউজহালা 'আলাইনা। অর্থ: '(বের হচ্ছি) আল্লাহর নামে, আল্লাহর উপর আমি ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পদস্খলন হ'তে কিংবা পথভ্রষ্টতা হ'তে কিংবা যুলুম করা হ'তে কিংবা অত্যাচারিত হওয়া থেকে কিংবা অজ্ঞতাবশত কারো প্রতি মন্দ আচরণ করা হ'তে বা আমাদের প্রতি কারো অজ্ঞতা প্রসূত আচরণ হ'তে'।[৩৭]

সফর অবস্থায় কিছু আদব :

সফর অবস্থায় কিছু ইসলামী আদব রয়েছে, যা প্রত্যেক মুসলিম সফরকারীকে পালন করা প্রয়োজন। যেমন-

১. সফরের শুরুতে সফরের দো‘আ পাঠ করা :

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) সফরে বের হওয়ার সময় উটের উপর ধীর-স্থিরতার সাথে বসার পর তিনবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলতেন। তারপর বলতেন,

﴿سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَه مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ﴾ اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَه اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

‘মহা পবিত্র সেই সত্তা, যিনি একে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব’ (যুখরুফ ৪৩/১৩-১৪)। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকটে আমাদের এই সফরে কল্যাণ ও তাক্বওয়া এবং এমন কাজ প্রার্থনা করি, যা আপনি পসন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের উপরে এই সফরকে সহজ করে দিন এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি এই সফরে আমাদের একমাত্র সাথী এবং পরিবারে ও মাল-সম্পদে আপনি আমাদের একমাত্র প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে পানাহ চাই সফরের কষ্ট, খারাপ দৃশ্য এবং মাল-সম্পদ ও পরিবারের নিকটে মন্দ প্রত্যাবর্তন হ’তে’।[৩৮]

২. সৎ লোকের সঙ্গী হয়ে সফর করা :

সফরে ভাল সঙ্গী থাকা যরূরী। কারণ সঙ্গী-সাথীর কারণে মানুষ ভাল-মন্দের দিকে ধাবিত হয়। সৎ সঙ্গীর আদেশ দিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, ‘তুমি নিজেকে রাখবে তাদেরই সঙ্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহবান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না; যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, সে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না’ (কাহাফ ১৮/২৮)।

অনুরূপভাবে ঈমানদারদেরকে বলেন,يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক’ (তাওবা ৯/১১৯)। আর এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তুমি মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন পাহেযগার লোক ব্যতীত অন্য কেউ না খায়’।[৩৯]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، ‘মানুষ তার বন্ধুর রীতি-নীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে, সে কি ধরনের বন্ধু গ্রহণ করেছে’।[৪০] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) সৎসঙ্গীকে সুগন্ধী বহনকারীর সাথে তুলনা করেছেন। যার সাথে থাকলে সুগন্ধী পাওয়া যায়। আর অসৎ সঙ্গীকে কামারের সাথে তুলনা করেছেন। যার সাথে থাকলে কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা দুর্গন্ধ পাওয়া যাবে’।[৪১]

৩. একাকী সফর না করা :

সফরকালীন সময়ে একাকী না গিয়ে তিনজন বা তার বেশী লোক সাথে রাখা উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ ‘একাকী সফরকারী হচ্ছে একটি শয়তান, আর একত্রে দু’জন সফরকারী দু’টি শয়তান। তবে একত্রে তিনজন সফরকারীই হচ্ছে প্রকৃত কাফেলা’।[৪২] একাকী সফরে কোন সমস্যা হ’লে বা মারা গেলে তাকে গোসল দেয়া, দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা, তার সাথে থাকা জিনিসগুলো সংরক্ষণ করা এবং তার মৃত্যুসংবাদ তার পরিবারে কাছে পৌঁছানোর সুবিধার্থে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে কাফেলার সাথে সফর করতে শরী‘আত উৎসাহ দিয়েছে।[৪৩]

ইবনে ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ ‘যদি লোকেরা একা সফরে কি ক্ষতি আছে তা জানত, যা আমি জানি, তবে কোন আরোহী রাতে একাকী সফর করত না’।[৪৪] ইবনে আববাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِئَةٍ، وَخَيْرُ الجُيُوْشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَةٍ- ‘সর্বোত্তম সঙ্গী হ’ল চারজন, সর্বোত্তম ছোট বাহিনী হ’ল চারশ’ জন, সর্বোত্তম বড় সেনাবাহিনী হ’ল চার হাযার জন। আর বারো হাযার সৈন্য স্বল্পতার কারণে কখনো পরাজিত হবে না’।[৪৫]

৪. তিন বা তার অধিক হ’লে একজনকে আমীর বানানো :

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ ‘তিন ব্যক্তি একত্রে সফর করলে তারা যেন নিজেদের মধ্য হ’তে একজনকে আমীর বানায়’।[৪৬]

৫. সফর অবস্থায় বিভক্ত না হয়ে একত্রিত থাকা :

আবু ছা‘লাবাহ আল-খুশানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সেনাবাহিনীর লোকজন যখন কোন স্থানে (বিশ্রামের জন্য) নামতেন তখন তারা বিভিন্ন গিরিপথে ও উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়তেন। সেজন্য রাসূলূল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِيْ هَذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلاً إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يُقَالُ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ-

‘এসব গিরিপথে ও পাহাড়ী উপত্যকায় তোমাদের বিভক্ত হয়ে পড়াটা শয়তানের ষড়যন্ত্র। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর থেকে যেখানেই তিনি নামতেন দলের লোকজন একত্রে অবস্থান করত। এমনকি এরূপ বলা হ’ল যে, যদি একটি কাপড় তাদের উপর বিছিয়ে দেয়া হয় তাদের সবাইকে এর মধ্যে ঢেকে নেয়া সম্ভব’।[৪৭]
একত্রিত হয়ে সব কাজ করার গুরুত্ব বর্ণনা করে অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ- ‘কোন তিন ব্যক্তি তারা (জনবহুল) গ্রামে থাকুক অথবা জনবিরল অঞ্চলে থাকুক, তাদের মধ্যে ছালাতের জামা‘আত কায়েম করা হয় না, নিশ্চয়ই তাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং অবশ্যই তুমি জামা‘আত কায়েম করবে। কেননা নেকড়ে বাঘ সেই ছাগল-ভেড়াকেই খায় যে দল ছেড়ে একা থাকে’।[৪৮]

৬. যালেমদের অঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করার সময় করণীয় :

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন হিজর (তাবূক যুদ্ধে যাওয়ার সময় ছামূদ জাতির ধ্বংসস্তূপের) এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন তখন বলেন, لاَ تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ، أَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ. ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ، وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ، ‘তোমরা এমন লোকদের আবাসস্থলে প্রবেশ করো না যারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে। প্রবেশ করবে ক্রন্দনরত অবস্থায়, যেন তাদের প্রতি যে বিপদ এসেছিল তোমাদের প্রতি সে রকম বিপদ না আসে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বাহনের উপর আরোহী অবস্থায় নিজ চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে নিলেন’।[৪৯]

৭. উপরে উঠতে ও নীচে নামতে দো‘আ পাঠ করা :

সফরে বা অন্য সময় উঁচু স্থানে উঠতে আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ স্বরূপ ‘আল্লাহু আকবার’ এবং নীচে নামতে ‘সুবাহানা-ল্লাহ’ বলা। জাবির (রাঃ) বলেন,كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا ‘আমরা যখন উপরের দিকে উঠতাম, ‘আল্লা-হু আকরাব’ ও যখন নীচের দিকে নামতাম তখন ‘সুব্হা-নাল্লাহ’ বলতাম’।[৫০] আবূ মূসা আল-আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, এক সফরে আমরা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন কোন উপত্যকায় আরোহণ করতাম, তখন ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ এবং ‘আল্লাহু আকবার’ বলতাম। আর আমাদের আওয়াজ অতি উঁচু হয়ে যেত। নবী করীম (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ، ‘হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও। তোমরা তো বধির বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছ না। বরং তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই আছেন, তিনি তো শ্রবণকারী ও নিকটবর্তী’।[৫১]

৮. নির্দিষ্ট গন্তব্যে পেঁŠছার পর দো‘আ পড়া :

খাওলাহ্ বিনতু হাকীম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন জায়গায় অবতরণ করে নিম্নোক্ত দো‘আটি পাঠ করবে তাহ’লে তাকে কোন জিনিস অনিষ্ট করতে পারবে না, তার ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ،

‘আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি সকল কিছুর অনিষ্টতা হ’তে আশ্রয় চাই’।[৫২]

৯. সফর অবস্থায় বেশী বেশী দো‘আ করা :

সফর অবস্থায় আল্লাহ দো‘আ কবুল করেন। তাই সফর অবস্থায় বেশী বেশী দো‘আ করতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ‘তিন ব্যক্তির দো‘আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়: পিতা-মাতার দো‘আ, মুসাফিরের দো‘আ, মাযলূমের দো‘আ’।[৫৩] হজ্জ বা ওমরার সফর হ’লে হজ্জের কাজের মধ্যে, ফাঁকে ফাঁকে অধিক দো‘আ করা। ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, الْغَازِي فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوْهُ وَسَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ، ‘আল্লাহর পথের সৈনিক, হজ্জ ও ওমরা যাত্রীগণ আল্লাহর প্রতিনিধি। তারা আল্লাহর নিকট দো‘আ করলে তিনি তা কবুল করেন এবং কিছু চাইলে তা তাদেরকে দান করেন’।[৫৪]

১০. ঘুম বা বিশ্রামের প্রয়োজন হ’লে চলাচলের রাস্তা পরিত্যাগ করা :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيْقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ،

‘তোমরা যখন উর্বর ভূমি দিয়ে পথ অতিক্রম কর, তখন উটকে ভূমি থেকে তার অংশ দাও (অর্থাৎ কিছুক্ষণের বিচরণের জন্য ছেড়ে দাও)। আর যখন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বা অনুর্বর ভূমি দিয়ে পথ অতিক্রম কর তখন তাড়াতাড়ি (তাদের চলার শক্তি বাকী থাকতে) তা অতিক্রম করে যাও। আর যখন রাত্রি যাপনের জন্য কোথাও অবতরণ কর, তখন পথে (তাবু খাটানো) থেকে সরে থাকবে। কেননা তা হচ্ছে জীবজন্তু ও সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদির রাত্রিবেলার আশ্রয়স্থল’।[৫৫]

সফর অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর ঘুমানোর নিয়ম সম্পর্কে অন্য হাদীছে এসেছে, إِذَا كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِيْنِهِ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ -‘তিনি সফররত অবস্থায় রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হ’লে ডান কাতে শুয়ে থাকতেন। আর ভোরের কাছাকাছি সময়ে জাগ্রত হ’লে তাঁর বাহু দাঁড় করিয়ে হাতের তালুতে ভর করে শুয়ে থাকতেন’।[৫৬]

১১. সকালে দো‘আ পাঠ করা :

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী করীম (ছাঃ) সফরে থাকতেন ভোর হ’লে বলতেন, سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ صَاحِبْنَا فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ، ‘সর্বশ্রোতা শ্রবণ করেছেন, আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি, আমাদের প্রতি তাঁর নে‘মতের স্বীকৃতি প্রদান করছি। হে আমাদের রব! তুমি আমাদের সাথী হও ও আমাদের প্রতি দয়া করো। আমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাই’।[৫৭]

১২. সফরে ব্যবহৃত পশু বা জিনিসের প্রতি সদয় হওয়া :

সফরের কাজে ব্যবহার হওয়া জিনিসের প্রতি সদয় হ’তে হবে। চাই তা পশু হোক বা আধুনিক যানবাহন হোক। পশু হ’লে তাকে সঠিক সময়ে খাদ্য-পানীয় দেওয়া বিশ্রামের ব্যবস্থা করা এবং তার প্রতি যুলুম না করা। আর আধুনিক যানবাহন হ’লে সেটা নষ্ট না করা অপ্রয়োজনীয় কিছু না লেখা ইত্যাদি।

১৩. সওয়ারী হোঁচট খেলে বলবে :

আবুল মালীহ (রহঃ) এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একটি সওয়ারীতে নবী করীম (ছাঃ)-এর পিছনে বসা ছিলাম। হঠাৎ তার সওয়ারী হোঁচট খেলে আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হয়েছে। তিনি বললেন, একথা বল না, যে শয়তান ধ্বংস হয়েছে। কেননা তুমি একথা বললে সে অহংকারে ঘরের মত বড় আকৃতির হয়ে যাবে এবং সে বলবে, আমার ক্ষমতা হয়েছে। অতএব বল, বিসমিল্লাহ বা আল্লাহর নামে। যখন তুমি বিসমিল্লাহ বলবে শয়তান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে মাছির মত হয়ে যাবে’।[৫৮]

১৪. সফরে কুকুর বা ঘণ্টা না রাখা :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ، ‘ফেরেশতারা ঐ সফরকারী দলের সঙ্গে অবস্থান করেন না, যাতে কোন কুকুর বা ঘণ্টা থাকে’।[৫৯] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ঘণ্টাই হ’ল শয়তানের বাঁশি’।[৬০]

১৫. সফরে সঙ্গী-সাথীদের যথাসাধ্য সাহায্য করা :

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা কোন সফরে নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি সওয়ারীতে আরোহণ করে আগমন করল। অতঃপর সে তার দৃষ্টি ডানে-বামে ফিরানো শুরু করল। তা দেখে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ ‘যার নিকট অতিরিক্ত সওয়ারী আছে, যার নেই তার জন্য যেন নিয়ে আসে, আর যার নিকট নিজের পাথেয়র অতিরিক্ত রয়েছে, যার নেই তার জন্য যেন নিয়ে আসে’।[৬১]

১৬. সমস্ত পাপকাজ থেকে বিরত থাকা :

সফরে সকল প্রকার দৃশ্যমান ও অদৃশ্য পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা যরূরী। বিশেষ করে হজ্জের সফরের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ، ‘হজ্জের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের উপর হজ্জ আরোপ করে নিল, তার হজ্জে অশ্লীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়’ (বাক্বারাহ ২/১৯৭)।

১৭. কোন গ্রামে প্রবেশের সময় দো‘আ পাঠ করা :

সফর কালে কোন গ্রামে প্রবেশ করলে নিম্নোক্ত দো‘আ পাঠ করে প্রবেশ করবে,

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا-

‘হে সপ্তাকাশ ও যা কিছু তার নীচে রয়েছে তার রব! হে সপ্ত যমীন ও তার উপরে যা কিছু রয়েছে তার রব, শয়তান ও যাদের তারা পথভ্রষ্ট করেছে তাদের রব এবং হে প্রবাহিত বাতাস ও বাতাসে যা কিছু উড়িয়ে নিয়ে যায় তার বর। নিশ্চয়ই আমরা তোমার নিকট এই গ্রাম ও এর অধিবাসীদের কল্যাণ কামনা করি এবং আমরা তোমার নিকট এই গ্রাম ও গ্রামবাসীদের ও এর মধ্যে যে অনিষ্ট ও অমঙ্গল আছে তা হ’তে আশ্রয় চাই’।[৬২]

১৮. কারো বাড়িতে/ঘরে প্রবেশের নিয়ম :

সফর অবস্থায় বা অন্য সময় কারো ঘরে বা বাড়ীতে প্রবেশের সময় বাড়ীওয়ালার অনুমতি নিবে এবং সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে’।[৬৩] বাড়ীওয়ালা কোন কারণে অনুমতি না দিলে বা ফিরে যেতে বললে ফিরে যাবে’ (নূর ২৪/২৮)।

পরিশিষ্টঃ

ওহির প্রকার

১. সত্য স্বপ্নঃ স্বপ্নের মাধ্যমে নাবী কারীম (ﷺ)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হয়।

২. ফিরিশতা দেখা না দিয়ে অর্থাৎ অদৃশ্য অবস্থান থেকেই রাসূল (ﷺ)-এর অন্তরে ওহী প্রবেশ করিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে নাবী কারীম (ﷺ) যেমনটি ইরশাদ করেছেনঃ

إن روح القدس نفث في روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله ، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته)

অর্থঃ ‘জিবরাঈল (আঃ) ফিরিশতা আমার অন্তরে এ কথা নিক্ষেপ করলেন যে, কোন আত্মা সে পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যে পর্যন্ত তার ভাগ্যে যতটুকু খাদ্যের বরাদ্দ রয়েছে পুরোপুরিভাবে তা পেয়ে না যাবে। অতএব, তোমরা আল্লাহকে সমীহ কর এবং রুজি অন্বেষণের জন্য ভাল পথ অবলম্বন কর। রুজি প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ায় তোমরা আল্লাহর অসন্তোষের পথ অন্বেষণে যেন উদ্বুদ্ধ না হও। কারণ, আল্লাহর নিকট যা কিছু রয়েছে তা তাঁর আনুগত্য ছাড়া পাওয়া দুস্কর।

৩. ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণপূর্বক নাবী কারীম (ﷺ)-কে সম্বোধন করতেন। তারপর তিনি যা কিছু বলতেন নাবী কারীম (ﷺ) তা মুখস্থ করে নিতেন। এ অবস্থায় সাহাবীগণ (রাঃ)ও ফেরেশতাকে দেখতে পেতেন।

৪. ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট ঘন্টার টুন টুন ধ্বনির মতো ধ্বনি শোনা যেত। ওহী নাযিলের এটাই ছিল সব চাইতে কঠিন অবস্থা। টুন টুন ধ্বনির সংকেত প্রকাশ করতে করতে ফিরিশতা ওহী নিয়ে আগমন করতেন এবং নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। ওহী নাযিলের সময় কঠিন শীতের দিনেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকত। তিনি উষ্ট্রের উপর আরোহণরত অবস্থায় থাকলে উট বসে পড়ত। এক দফা এইভাবে ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উরু যায়দ বিন সাবেত (ﷺ)-এর উরুর উপর ছিল। তখন তাঁর উরুতে এতই ভারবোধ হয়েছিল যে মনে হয়েছিল যেন উরু চূর্ণ হয়ে যাবে।

৫. নাবী কারীম (ﷺ) ফিরিশতাকে কোন কোন সময় নিজস্ব জন্মগত আকৃতিতে প্রত্যক্ষ করতেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় সেই অবস্থাতেই তিনি তাঁর নিকট ওহী নিয়ে আগমন করতেন। নাবী কারীম (ﷺ)-এর এ রকম অবস্থা দু’বার সংঘটিত হয়েছিল যা আল্লাহ তা‘আলা সূরাহ ‘নাজমে’ উল্লে-খ করেছেন।

৬. পবিত্র মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন আকাশের উপর অবস্থান করছিলেন সেই সময় আল্লাহ তা'আলা নামায এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সরাসরি হুকুমের মাধ্যমে ওহীর ব্যবস্থা করেছিলেন।

৭. আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে নাবী কারীম (ﷺ)-এর সরাসরি কথোপকথন যেমনটি হয়েছিল, তেমনি মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে হয়েছিল। মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে যে আল্লাহ তা'আলার কথোপকথন হয়েছিল কুরআন কারীমে তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে নাবী কারীম (ﷺ)-এর কথোপকথনের ব্যাপারটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে (কুরআন দ্বারা নয়)।

কিছু প্রশ্নঃ
১)প্রশ্নঃ নবী এবং রাসূল(আলাইহিমুস সালাম)দের মধ্যে আসমানি কিতাব নাযিল হওয়া বা না হওয়া ব্যতীত তাঁদের দায়িত্ব -কর্তব্য বা মর্যাদায় কোন পার্থক্য আছে কি?
নবী ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের মাঝে অনেক মতবিরোধ রয়েছে।
সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মত হলোঃ
রাসুল তাহাকে বলা হয়, যিনি নতুন শরীয়ত নিয়ে এসেছেন।
এর দুই ছুরতঃ
০১) ঐ শরীয়ত একেবারেই নতুন,ইতিপূর্বে এই শরীয়ত কেহই পেশ করেননি।
(০২) ইতিপূর্বে ঐ শরীয়ত নিয়ে কেহ এসেছিলো,কিন্তু যেই কওমের কাছে তিনি এসেছেন,তাদের কাছে এটা নতুন।
যেমন হযরত ঈসমাইল আঃ তার বাবা হযরত ইব্রাহিম আঃ এর শরীয়ত নিয়েই এসেছিলেন,কিন্তু জুরহাম গোত্রের নিকট ঐ শরীয়ত নতুন ছিলো,যেনো এই শরীয়ত ঐ কওমের জন্য নতুন ছিলো।

,
★এবং নবী তাহাকে বলা হয় যাহার উপর ওহি আসে,চাই তিনি নতুন শরীয়ত নিয়ে আসুক,বা পুরাতন শরীয়তেরই তিনি মুবাল্লিগ হোক।
যেমন বনী ঈসরায়েলের অধিকাংশ নবীই হযরত মুসা আঃ এর শরীয়তের দাওয়াত দেওয়ার জন্য এসেছিলেন।

,
শাইখুল ইসলাম আল্লামা শিব্বির আহমেদ উসমানী রহঃ নবি ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেন যে নবী বলা হয় যাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি আসে।

,
আম্বিয়ায়ে কেরামদের মধ্যে কিছু নবীর বিশেষত মর্যাদা দেওয়া হয়েছিলো,যেমন তাদেরকে কাফেরদের মোকাবেলায় পৃথক উম্মতের কাছে পাঠানো হয়েছিলো,অথবা নতুন কিতাব এবং স্বয়ংসম্পুর্ন শরীয়ত দেওয়া হয়েছিলো।

২)প্রশ্নঃতাক্বদীরের ২ নং স্তরে বলা হয়েছে মায়ের গর্ভে ৪০ দিন পর রুহ ফুঁকে দেয়া হয় এবং ৪ টি জিনিস লিখে দেয়া হয়। আমরা তো জানি প্রত্যেকের ভাগ্য ৫০ হাজার বছর পূর্বেই লেখা হয়েছে। তাহলে কি জন্মের পর থেকেই ভাগ্যের সংযোজন বিয়োজন শুরু হয়ে যায়?

তাকদির বা পূর্বলেখনের স্তর চারটি। তাহলো,

১. তাকদিরে আম : সব সৃষ্টির জন্য লাওহে মাহফুজে যে ভাগ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে তাকে তাকদিরে আম বা সাধারণ ভাগ্য বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আপনি কি জানেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সে বিষয়ে পরিজ্ঞাত, নিশ্চয়ই তা কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, নিশ্চয়ই তা আল্লাহর কাছে খুবই সহজ। ' (সুরা হজ, আয়াত : ৭০)

২. তাকদিরে উমুরি বা জীবনব্যাপী ভাগ্যলিপি : এ ধরনের তাকদির লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ তাকদির থেকে ভিন্ন। কেননা তাকদিরুল উমুরি পরিবর্তন হয়, এমনকি বিলুপ্তও হয়। আর যা লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে তা কখনই পরিবর্তিত হয় না। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ যা চান বিলুপ্ত করেন এবং যা চান অবশিষ্ট রাখেন। তাঁর কাছে রয়েছে মূল কিতাব। ' (সুরা রাদ, আয়াত : ৩৯)

ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলতেন, 'হে আল্লাহ! যদি আপনি আমাকে হতভাগ্য লিখে থাকেন তবে তা মুছে দেন এবং আমাকে ভাগ্যবান লিখে দেন। ' (কিসমুল হাদিস : ৫/১৩)

মুহাদ্দিসদের মত হলো, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফেরেশতাদের কাছে বিদ্যমান ভাগ্যলিপি।

৩. তাকদিরে সানুবি বা বার্ষিক ভাগ্যলিপি : তা লাইলাতুল কদরে লিপিবদ্ধ করা হয়। আল্লাহ বলেন, 'এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়। ' (সুরা দুখান, আয়াত : ৪)

৪. দৈনন্দিন ভাগ্যলিপি : প্রতিদিন আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার জন্য যা দান করে থাকেন তাকেই দৈনন্দিন ভাগ্যলিপি বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত। ' (সুরা আর রহমান, আয়াত : ২৯)

৩)প্রশ্নঃ বর্তমান যে সারগোসি মাদার নামে জঘন্য কর্ম শুরু হয়েছে তা কি কিয়ামতের আলামত যেমন দাসী তার মনিবকে জন্ম দিবে এই অংশটুকুর আওতায় পড়ে?

এটি একটি চমৎকার প্রশ্ন। হ্যাঁ। এটিও হাদিসে উল্লেখিত দাসীর গর্ভে মালিকের জন্মের অন্তর্ভুক্ত। কারন সারগোসির ক্ষেত্রে যে ঐ নারীর গর্ভ ভাড়া নেয় সে পক্ষান্তরে ঐ নারীরই মালিক, সুতরাং তার সন্তানও পক্ষান্তরে মালিকপক্ষের হিসেবে মালিকই বটে। সুতরাং বাচ্চাটি নিজের দাসীর গর্ভেই জন্ম নেয়। এবং জন্মের

পরেও এই বিষয়টি আরো প্রকট হয়ে বুঝা যায়। কারণ এরপর থেকে ঐ সন্তানের সাথে ঐ গর্ভধারিনীর সাথে আর কোনো সম্পর্ক থাকেনা। আরেকটি হাদিসে আছে কেয়ামতের আলামতের মধ্যে একটি হলো- শেষ জমানায় পরিচয়হীন সন্তান বেড়ে যাবে।

ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ

সমাপ্ত